# অনন্যা কাদম্বিনী

সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

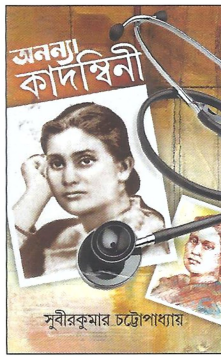


কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার প্রথম মহিলা ডাক্তার। জীবনে প্রতিটি পা তাঁকে এগোতে হয়েছে লড়াই করে। সমাজ প্রতিকূল। সমাজপতিরা রক্ষণশীলতার দুর্গে আবদ্ধ। তারই মধ্যে আধুনিকতার অভিমুখে তাঁর যাত্রা। অকুতোভয় তিনি। বিয়ে করলেন নিজের মনোমত পাত্রকে। জাহাজে একা পাড়ি দিলেন বিদেশে। নিয়ে এলেন একের পর এক বিলিতি ডিগ্রি। যোগ দিলেন ইডেন ও লেডি ডাফরিন হাসপাতালে। খুলে বসলেন চেম্বার। কুৎসা ছড়ানো হল তাঁর নামে। প্রতিকারের আশায় আদালতের শরণাপন্ন হলেন। সংগ্রামী এই নারীর জীবন ও কর্মকে ধরে রাখা হয়েছে এই বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে। শুধু কী তাই। সেকালের সংবাদ-সাময়িকপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে দুর্লভ সব খবর উদ্ধার করে পেশ করা হয়েছে একালের পাঠকের দরবারে। একই সঙ্গে আছে একটি নাটক। নাট্যকারের কল্পনায় উদ্ভাসিত কাদম্বিনী—যেটি পড়ে পাঠক আবিষ্কার করবেন অনন্যা এই নারীকে।

এই অনন্যা নারীর প্রকৃত রূপকার তো দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর জীবন ও কর্মের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণও ধরা আছে এই বইতে। সব মিলিয়ে নিবিড় গবেষণা ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের যুগলবন্দি।

# অনন্যা কাদম্বিনী

সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙলার মুখ

বাঙলার মুখ

**প্রথম প্রকাশ :** মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি: (১৯৪০ শকাব্দ)

পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ : মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ; জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি:; ১৯৪১ শকাব্দ, কলকাতা বইমেলা।

**প্রকাশক**
বাঙলার মুখ প্রকাশন, ২১/১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

**© লেখক**

প্রকাশকের ও লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা আইনত দণ্ডনীয়। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**মুখ্য প্রাপ্তিস্থান**
বইওয়ালার বই-আপণ, ২১/১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

**যোগাযোগ**
শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ বইওয়ালা প্রদীপকুমার চক্রবর্তী/ পরিচালক বাঙলার মুখ প্রকাশন
৯১৬৩৬৩২৭৭৭/ ৯০৫১৮১৩২১৫/ e-mail : banglardip2009@gmail. com.

**প্রচ্ছদ** : মৃণালকান্তি দাস

বাঙলার মুখ প্রকাশন কর্তৃক, ২১/১এ, পটুয়াটোলা লেন,কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও জয়শ্রী প্রেস থেকে মুদ্রিত। বর্ণবিন্যাস 'কসমিক প্রিন্ট-ও-স্ক্রিপ্ট'-এর পক্ষে সুশান্ত মহাপাত্র।

**১৮০.০০ টাকা**

Ananya Kadambini
by Dr. Subir Kumar Chattopadhyoy.
1st Published January 2018. ❑ 2nd ed. January 2020
Price 180.00 INR.
ISBN : 978-93-84108-75-5

উৎসর্গ

আমার স্ত্রী ডাঃ অপর্ণা ঘোষ চ্যাটার্জীকে দিলাম।

সূচিপত্র


১. নিবেদন ৭
২. ভূমিকা ৯
৩. প্রসঙ্গ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ১১
৪. সংবাদ-সাময়িকপত্রে কাদম্বিনী ২৬
৫. 'অনন্যা কাদম্বিনী' (চরিত নাটক) ৪৫
৬. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ফিরে দেখা ৯৫

# নিবেদন

উনিশ শতকের নবজাগরণ বুদ্ধিজীবীদের মন আলোকিত করেছিল। বাঙালি চিকিৎসকদের ওপর এই নবজাগরণের প্রভাব নিয়ে ২০০১ সাল থেকে নিবিড়ভাবে গবেষণা করেছি।

ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন নবজাগরণের প্রভাবে গড়ে ওঠা এক বিশিষ্ট নারীচরিত্র। তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।

এই মহান নারীর জীবন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তৎকালীন সংবাদ-সাময়িক-পত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি বার বার দেখতে হয়েছে। লেখকের এই প্রয়াস বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে।

কাদম্বিনীর জীবন নাটকীয়তায় ভরা। এই নাটকীয় মুহূর্তগুলি নিয়ে রচিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত 'অনন্যা কাদম্বিনী' নাটক। কাদম্বিনীর জীবন সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করতে গেলে তাঁর স্বামী, ব্রাহ্ম সমাজের বিপ্লবী নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। তাই গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে দ্বারকানাথের জীবন ও সাধনা।

কাদম্বিনী-দ্বারকানাথের বিষয়ে আমার মনের জানলা খুলে দেন অধ্যাপক রমেন সর। গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে যিনি প্রায় হাতে ধরে আমায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁর নাম অধ্যাপক স্বপন বসু। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুবিমল মিশ্র। শুধুমাত্র আমার প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসার টানে বইটির ভূমিকা লিখেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ। গবেষণার প্রথম পর্যায়ে কাদম্বিনী, দ্বারকানাথের ওপর লেখা প্রবন্ধ ও 'অনন্যা

কাদম্বিনী' নাটক, *'এবং এই সময়'* পত্রিকায় প্রকাশ করেন পত্রিকা সম্পাদক অধ্যাপক অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধগুলি বই আকারে লেখার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করেন।

প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা অধ্যক্ষ এবং কার্যনির্বাহী সভার সদস্য সাহিত্য-বান্ধব শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী।

এঁদের সবাইকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। দীর্ঘ দিনের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফসল 'অনন্যা কাদম্বিনী' পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

কলকাতা,
অক্টোবর, ২০১৭

সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

## দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

অনন্যা কাদম্বিনী যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমি ভাবতেও পারিনি ছ মাস যেতে না যেতে প্রথম সংস্করণ যাবে নিঃশেষ হয়ে।

বইটি পড়ে অভিভূত হয়ে সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষ পাঠকপ্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

পাঠকদের অনুরোধে পরিমার্জিত ও চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হল দ্বিতীয় সংস্করণ।

পাঠকদের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিগুলি থেকে মাত্র কয়েকটি এই সংস্করণে দেওয়া হল। যে গুলি দেওয়া গেল না তার জন্য আমরা দুঃখিত।

আশা করি এই সংস্করণটিও পাঠকদের অনুকূল্য বঞ্চিত হবে না।

সুবির কুমার চট্টোপাধ্যায়

# ভূমিকা

জন্মসূত্রে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বাঙালি কিন্তু অর্জনসূত্রে তিনি বাঙালি পরিচয়কে ছাপিয়ে ভারতীয় ভাবমূর্তিতেই আসীন। আমি খুব সাহস করে বলতে পারব না যে, বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতের অন্য প্রদেশের সাধারণ মানুষ কাদম্বিনী সম্পর্কে কতখানি খোঁজ-খবর রাখেন বা উৎসাহ বোধ করেন। হয়তো তথ্যানুসন্ধানীরা কিছু খবর রাখতে পারেন। কিন্তু আমি একবার উৎসাহিত হয়ে বাঙালি সাধারণেরা তাঁর সম্পর্কে কতখানি ওয়াকিবহাল তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে খুব একটা সাড়া পাইনি। এটা স্বীকার না করলে অপরাধ হবে যে, একেবারেই কেউ সচেতন নন এমন মন্তব্য করলে। বেশ কিছু মানুষ তাঁর নাম শুনেছেন, তিনি যে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে, এমনকি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম মহিলা চিকিৎসক—বিলেত-ফেরতাও—এমন বিষয়ও গোচরীভূত হয়েছে। তবে যাঁদের 'শিক্ষিত' বলে ভেবে থাকি তাঁদের মূকবৃত্তি অবলম্বন করে থাকাটা যেন বরদাস্ত করা যায় না।

কাদম্বিনী দেবী সম্প্রতি একটু বেশি মাত্রায় পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন। কারণ তাঁর সার্ধজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন গত ছ-সাত বছর ধরে পালিত হয়ে চলেছে। জন্মবর্ষ নিয়ে বিবাদ আছে (১৮৬১ অথবা ১৮৬২?)। চর্চা শুরু হয়েছে বহুকাল ধরে—বিশেষত বেথুন বিদ্যালয়/ কলেজের শতবর্ষ থেকে তো বটেই। তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে অন্যান্য মহিলা ভারতীয় চিকিৎসকদের প্রসঙ্গেও। পৃথকভাবে বই লেখা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। মহিলা চিকিৎসক নিয়ে গৌরব করার সূত্রে এই গৌরবটুকু স্মৃতিধার্য যে, তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা প্রথম ভারতীয় মহিলাও। এবং একথা ভেবে একালের মহিলাদেরও হর্ষোৎপাদন হওয়া উচিত যে এই মহিলার পঠন-পাঠনের জন্যেই বেথুন স্কুলে প্রথম এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস) এবং পরে বি. এ. ক্লাস খোলা হয়। এই বিশ্ব গৌরব অনুভব করতে পারেন এই সংবাদে তিনি এবং চন্দ্রমুখী বসু যুগ্মভাবে প্রথম ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসেবে গ্র্যাজুয়েট হন ব্রিটিশ শাসিত দেশসমূহের মধ্যে।

তাঁর পঠন-পাঠন এবং ডিগ্রি অর্জনের পথ আদৌ মসৃণ ছিল না। নতুন পথ কেটে তাঁকে পথ চলতে হয়েছিল—পথ নির্মাণের সেই ইতিহাস শিরোধার্য কিন্তু বিপদসঙ্কুল

এবং অমার্জিত ছিল। তা জানবার জন্যে পাঠক এখন অতি অবশ্যই বর্তমান বইটির উপর নির্ভর করতে পারেন। যে-সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন সেই ১৮৮৩ সালেই তাঁর বিবাহ হয়। এটি কোনো পরিণয় সংবাদ নয়। এটি একটি পরিণাম, একটি পরিণতির সূচনা। কাদম্বিনীর কৃতিত্বের সঙ্গে বিজড়িত আছেন যুগ্মভাবে তাঁর স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় তাঁদের কালের 'হিরো' দ্বারকানাথ। তাঁর কথাও এই গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠায় মর্যাদার সঙ্গে উচ্চারিত—প্রচারিত। দমদমের ভারত-রেডিও গলিতে জংলি গাঙ্গুলির কাছে (প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি) তাঁর মা এবং সহোদরা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলির (কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মহিলা অল্‌ডারম্যান) কতো কথাই না শুনেছি কতোবার, আবার করে পড়ার সুযোগ দিলেন আর এক খ্যাতনামা চিকিৎসক সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়। চিকিৎসা তাঁর জীবিকা, কিন্তু সাহিত্য তাঁর জীবন। সেই সূত্রেই তিনি বাঁধা পড়ে গেছেন আমার সঙ্গে। এবং আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থরচনার সূত্রে বেঁধে ফেলবেন অজস্র পাঠককেও।

কাদম্বিনীকে নিয়ে চর্চার ইতিহাসে ডাক্তারবাবু একটা স্মরণযোগ্য নাম হয়ে থাকবেন ভবিষ্যতেও। কারণ তিনি এই জীবন ও এই জীবনের সময়কালকে রূপান্তরিত করেছেন সাহিত্যের আর একটি অনুষঙ্গ—নাট্যানুষঙ্গে। অবশ্যই এই জীবন নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ এবং নাট্যসম্ভাবনার উৎসভূমি। আমি বিস্মিত হয়েছি তাঁর সংযম এবং নাট্যবোধে। এখন তো পাড়ায় পাড়ায় এই নাটক অভিনীত হচ্ছে—এমন সংবাদ পাবার জন্যে লোভাতুর হয়ে উঠছি। ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানাব না অভিনন্দন জানাব—স্থির করতে না পেরে আলিঙ্গন জানিয়ে বসলাম। তিনি কুলপবিত্র করেছেন, দেশজননীকে কৃতার্থতার স্পর্শ দিয়েছেন।

বারিদবরণ ঘোষ

# প্রসঙ্গ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

কথামুখ

উনিশ শতকে বাঙালি মেয়েদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। তার জন্মমুহূর্তে শঙ্খধ্বনি হত না। মানবিক প্রায় সমস্ত অধিকার থেকে নারী ছিল সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। ভালোভাবে জ্ঞান হবার আগেই তাদের বিবাহের ব্যবস্থা হত। এরপর এগারো-বারো বছর বয়স থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে চলত বারংবার সন্তানের জন্ম দেওয়া।

অনেক মেয়ের জন্য আবার অপেক্ষা করত আরও অনেক যন্ত্রণা। ছিল বিনা প্রতিবাদে বহুপত্নীক স্বামীর ঘর করা। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেককে যেতে হত সহমরণে। যাঁরা এর হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন তাঁদের বহন করতে হত সারাজীবন ব্যাপী বৈধব্যের অভিশাপ। স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা ছিল একান্ত শোচনীয়। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। বরং পড়াশোনা করলে মেয়েরা বিধবা অথবা কুলত্যাগিনী হবেন এমনটিই ছিল তৎকালীন ধারণা।

বাঙালি মেয়েদের এই অসহায় অবস্থা উনিশ শতকের মুক্তমনা সংস্কারকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। এঁদের প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠল নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন আন্দোলন—সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন, কৌলীন্যপ্রথা বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, সহবাস সম্মতি আন্দোলন ও পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন।

এইসব আন্দোলনের ফলে মেয়েরা স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরার হাত থেকে রক্ষা পান, কৌলীন্যপ্রথার হাত থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। চালু হয় সহবাস সম্মতি আইন। বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে জোরালো জনমত গড়ে ওঠে।

এরই পাশাপাশি সমাজের অর্ধাংশকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা যে ঠিক হচ্ছে না—একথা সচেতন কিছু মানুষ অনুভব করতে শুরু করেন। হিন্দু সমাজপতি রাধাকান্ত দেব, রামমোহন অনুরাগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর এগিয়ে এলেন। ডিরোজিওর ছাত্র-শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক অবদান রাখেন। কিন্তু প্রথম মহিলা স্কুল স্থাপন করেন

রবার্ট মে নামে একজন মিশনারি। এরপর আরো কয়েকটি মিশনারি স্কুল গড়ে ওঠে। মিশনারিদের অবশ্য আসল উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। তাই এই সকল স্কুলে ধর্মশিক্ষার ওপর ভীষণ জোর দেওয়া হত। বাইবেল পড়া ছিল বাধ্যতামূলক। ধর্মশিক্ষার এই বাড়াবাড়ির জন্য বাঙালিরা এইসব স্কুলে মেয়েদের পাঠাতে আগ্রহ বোধ করেননি।

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে বারাসাতে মধ্যবিত্ত, ভদ্র পরিবারের মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপিত হয়।

এরপর ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি পরে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন গতিলাভ করে।

এর পর বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, নদিয়া, ২৪ পরগনা, ঢাকা, বরিশাল, পাবনা, যশোহর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠতে লাগল।

এরই পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরা এর বিরোধিতায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। মেয়েরা শিক্ষা লাভ করলে সমাজ-সংসার রসাতলে যাবে, তাই এই অপপ্রয়াস বন্ধ করার আহ্বান জানালেন তাঁরা। ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বেদব্যাস পত্রিকা লিখল—

> "প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা ইহার দ্বারা নারীর পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না, এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়।... বিদ্যা নানারূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু।" (বেদব্যাস, বৈশাখ ১২৯৬)

কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন—

> "আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
> এক্না বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে।
> যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
> তখন এবি শিখে বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে।
> সব কাঁটা চামচ ধরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।
> এরা আপন হাতে বাগিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
> বুঝি হুট করে বুট পায়ে দিয়ে, চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।"

কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার কল্যাণকর দিকটি জনমানসে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের প্রচেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণ

মানুষের বিরূপতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো আরম্ভ হয়।

## কাদম্বিনী—জন্ম ও শিক্ষার সূচনা

১৮৬১ অথবা ৬২ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুরে কাদম্বিনী বসুর জন্ম। তাঁদের আদি বাড়ি বরিশালের চাঁদসি গ্রাম। পিতা ব্রজকিশোর বসু ছিলেন ভাগলপুর স্কুলের হেডমাস্টার। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্রজকিশোর ভাগলপুরে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা ও ভারতে প্রথম মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। এই আন্দোলনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বন্ধু অভয়চরণ মল্লিক। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে ব্রজকিশোর ছিলেন খুবই উৎসাহী। কাদম্বিনীর প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর বাবার কাছে। শিক্ষক ও সমাজসেবী ব্রজকিশোর কাদম্বিনীর চরিত্র গঠনে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেন। পড়াশোনায় মেয়ের আগ্রহ দেখে তিনি মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং তাকে বালিগঞ্জের হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। ১৮৭৬ সালে স্কুলটির নাম হয় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। কাদম্বিনীর অধ্যয়ন কালেই এই বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়।

## হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও দ্বারকানাথ—এক মহান সম্পর্কের সূচনা

বিক্রমপুরের যুবনেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা থেকে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে একটি পত্রিকা বের করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁরা কয়েকজন যুবক মিলে বেশ কয়েকজন কুলীন কন্যাকে উদ্ধার করে কলকাতায় দুর্গামোহন দাসের কাছে পাঠান। এই সমস্ত অল্পবয়সী মেয়েদের শিক্ষার কী ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে তাঁরা ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষালয়ে অঙ্ক এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। নব্যদলের পুরোভাগে থাকা দ্বারকানাথ মেয়েদের উচ্চশিক্ষালাভের ব্যবস্থা করতে আগ্রহী ছিলেন। দুর্গামোহন বাবুর সহায়তায় এবং ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের উদার আর্থিক সাহায্যে বালিগঞ্জের হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন—দ্বারকানাথ, মিস্ অ্যাকরয়েড ও মিসেস ফিয়ার। ১৮৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ২২, বেনিয়াপুকুর লেনে মিস্ অ্যাকরয়েডকে তত্ত্বাবধায়িকা করে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের যাত্রা হল শুরু। শুরুতে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী ছিলেন।

এই বোর্ডিং স্কুলের পরিচালনার ভার প্রায় এককভাবে গ্রহণ করলেন দ্বারকানাথ। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, "অর্থসংগ্রহ করা, যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করা, ছাত্রী নিবাসে ছাত্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যের ভার একা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পড়িয়া গেল।... মানুষ এতদূর পরিশ্রম করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য।"

১৮৭৫ সালের এপ্রিলে মিস অ্যাকরয়েড ঐতিহাসিক হেনরি বেভারিজকে বিবাহ

করেন। ফলে ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠে যায়। এক মাসের মধ্যে ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে দ্বারকানাথ বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবারও আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাস তাঁর পাশে ছিলেন।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা যাতে গৃহকর্ম নিপুণা হয় তাই ছাত্রীদের পালা করে রান্না করতে হত। বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো হত সেলাই।

সে সময় স্বাস্থ্য, ভূগোল ও অঙ্কের ভালো বই ছিল না। তাই দ্বারকানাথ বেশ কিছু বই লিখলেন। ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক সংগীত সকল' সংগ্রহ করে তিনি প্রকাশ করেন।

কয়েক বছর পরে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

দ্বারকানাথ তাঁর সকল ছাত্রীদের কাছেই ছিলেন অসম্ভব শ্রদ্ধেয় এবং জনপ্রিয়। তাঁর এক ছাত্রী আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের স্ত্রী অবলা বসুর স্মৃতিচারণ থেকেই তা স্পষ্ট জানা যায়—

"দ্বারকানাথের কর্মপরায়ণতার স্মৃতি এখনও জাগ্রত আছে।... স্কুলের সমস্ত বন্দোবস্ত এমনকি রুটিন পর্যন্ত দ্বারকানাথেরই। ইংরেজি ছাড়া সব বিষয় তিনিই পড়াতেন।... হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের পর বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়। এখানেও তিনিই উৎসাহদাতা। সমস্ত শক্তি দিয়া স্কুল চালাইয়াছেন।... আমরা দ্বারকানাথের কাছেই পড়িয়াছি। স্কুলে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার দৃষ্টান্তে ভবিষ্যত জীবনের কর্মপ্রেরণা পাইয়াছি।" সম্ভবত ১৮৭৫ সালে কলকাতায় এসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ ভর্তি হন কাদম্বিনী। তখন তাঁর বয়স ১৩ অথবা ১৪। সেই বছরই দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। আদর্শ শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালক দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেন। তাঁর মনে দ্বারকানাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জন্ম হয়। তিনি দ্বারকানাথের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এই শ্রদ্ধা ও প্রেরণার বিষয়টি পরবর্তীকালে অন্য মাত্রা নিয়ে গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হয়।

বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় কাদম্বিনীর সঙ্গে দ্বারকানাথের নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ অনেকটাই কমে গেল। কয়েক বছর ধরে শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যে এক অন্তরঙ্গ নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা কিন্তু রয়ে গেল অম্লান। অন্তঃসলিলা নদীর মতো তা প্রবাহিত হতে থাকল দু'জনেরই অন্তঃকরণে—দিন দিন তা হয়ে উঠল আরো গাঢ়, আরো গভীর। এই সম্পর্কেরই পরিণতি আমরা লক্ষ করব কাদম্বিনীর পরবর্তী জীবনে, যখন সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে দ্বারকানাথকে তিনি বেছে নিলেন জীবনসঙ্গী হিসাবে।

## উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচন

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভুবনমোহন বসুর কন্যা চন্দ্রমুখী দেরাদুনের ডেরা স্কুল ফর নেটিভ ক্রিশ্চান গার্লস স্কুলের ছাত্রী হিসাবে এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে চেয়ে আবেদন করলেন। বহু আলোচনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চন্দ্রমুখীকে শর্তসাপেক্ষে এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেন। শর্ত ছিল তাঁকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী বলে স্বীকার করা হবে না। এবং পাশের যোগ্য নম্বর পেলেও উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকায় তাঁর নাম প্রকাশিত হবে না। সুতরাং চন্দ্রমুখী এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পাশের তালিকায় তাঁর নাম প্রচারিত হল না।

বেথুন স্কুলের দুই ছাত্রী কাদম্বিনী ও সরলা এনট্রান্স পরীক্ষার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এবার দ্বারকানাথ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অনুমতির ব্যাপারে উঠেপড়ে লাগলেন। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন স্যার আর্থার হবহাউস। বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ ছিলেন একজন নারীহিতৈষী। দ্বারকানাথ তাঁকে সব কিছু বোঝালেন, মনোমোহন ঘোষ এবং রিচার্ড গার্থ এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন। অবশেষে স্যার আর্থার হবহাউসের প্রচেষ্টায় অচলায়তনের দ্বার খুলল। ইউনিভার্সিটি সিদ্ধান্ত নিল যে, কাদম্বিনী ও সরলা এই দুই ছাত্রীকে একটি পরীক্ষায় বসতে হবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রবেশিকা বা এনট্রান্স পরীক্ষায় বসা যাবে। দু'জনেই এই পরীক্ষায় বসে উত্তীর্ণ হলেন। পরীক্ষক ছিলেন পেঁপ (ইংরেজি), গ্যারেন্ট (অঙ্ক), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইতিহাস), এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার (বাংলা)।

এরপর এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষার পালা। সরলার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় তিনি পরীক্ষায় বসতে পারলেন না। কাদম্বিনী একাই পরীক্ষায় বসলেন।

সন ১৮৭৮, ডিসেম্বর মাস, কাদম্বিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। মাত্র ১ নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগে পাশ করতে পারেননি। অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসে গেলেন কাদম্বিনী। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর কাদম্বিনীর জন্য মাসিক ১৫ বৃত্তি প্রদান করলেন। শর্ত ছিল কাদম্বিনীকে অবশ্যই এফ এ পড়তে হবে। এছাড়া ছোটলাট বাহাদুর কাদম্বিনীকে উপহারস্বরূপ পাঠান বই এবং একটি স্বর্ণপদক।

কাদম্বিনীর জন্যেই বেথুন স্কুলের সঙ্গে কলেজ খোলার দাবি উত্থিত হল। কলেজে প্রথম অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের অধ্যাপক শশিভূষণ দত্ত। একমাত্র ছাত্রী ছিলেন কাদম্বিনী। ১৮৮০ সালে কাদম্বিনী এফ এ পাশ করলেন তৃতীয় বিভাগে।

এরপর তিনি বেথুন কলেজে বি এ পড়বার জন্য ভর্তি হন। এবার তিনি সহপাঠিনী হিসাবে পান চন্দ্রমুখী বসুকে। ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল থেকে এফ এ পাশ করে চন্দ্রমুখী বেথুনে বি এ পড়বার জন্য ভর্তি হন।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হলেন। তখনও ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বার মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। সারা দেশে বি এ পরীক্ষায় কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখীর সাফল্যের খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

'ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ' এই প্রসঙ্গে কুমারী কাদম্বিনীর নিবাস বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসী গ্রামের উল্লেখ করে লেখে—"এই রমণীরত্ন পূর্ববঙ্গের রমণীসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।" (ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ, ফাল্গুন, প্রথম পক্ষ, ১২৮৯) কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি মেয়েদের কূপমণ্ডূকতা দেখে হতাশ হয়ে ব্যঙ্গ কবিতা 'বাঙালীর মেয়ে' লিখেছিলেন। তিনিই এবার কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখীর সাফল্য দেখে লিখলেন—

হরিণ নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা।
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
অই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙালীর মেয়ে"
তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে।
বেঁচে থাক, সুখে থাক চিরসুখে আর।
কে বলে রে বাঙালীর জীবন অসার?
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?
ভাসিল আনন্দভেলা কালের জুয়ারে।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।

বিবাহ—এক দায়বদ্ধ দাম্পত্যের সূচনা

শিক্ষক দ্বারকানাথের প্রতি কাদম্বিনীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রেমে রূপান্তরিত হল। ১৮৮৩ সালে দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। 'আসামের চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ' গ্রন্থের লেখক অমর দত্ত মন্তব্য করেন—'কাদম্বিনী বসু কর্তৃক দ্বারকানাথকে বিবাহের জন্য নির্বাচন নারীজাতির হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি বলে অভিহিত করা অযৌক্তিক হবে না।' এই ঘটনা তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজে ঝড় তুলেছিল। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত ব্যাপারকে সর্বজনীন করে দেখার একটা প্রবণতা আছে। এই বিবাহ ছিল অসবর্ণ বিবাহ। পাত্র ও কন্যার বয়সের ছিল বিস্তর ফারাক। অসামান্যা সুন্দরী কাদম্বিনীর জন্ম ১৮৬১ সালে, দ্বারকানাথের জন্ম সন ১৮৪৪। বয়সে ১৭ বছরের ফারাক। এছাড়া দ্বারকানাথ ছিলেন বিপত্নীক ও দুই সন্তানের পিতা। কন্যা বিধুমুখী। পুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন মানসিক প্রতিবন্ধী। তাই দ্বারকানাথের বন্ধুরা এই

বিয়ে অনুমোদন করেননি। বিয়ের রেজিস্ট্রার হন দুর্গামোহন দাস। তিন আইন অনুসারে ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এই বিবাহ সম্পর্কে 'পরিচারিকা' পত্রিকা জানায়:—

"সংবাদ—বি. এ পরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুর সহিত শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। শুনিলাম এই বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু ব্যাংলার, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি.এ., শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্নবাবু প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিবাহ সভায় উপস্থিত হন নাই। শুনা যায় দ্বারিবাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি। অথচ তাঁহার বিবাহে সাধারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীর সভ্য ও প্রচারকগণ উপস্থিত রহিলেন না। কেন যে উপস্থিত রহিলেন না তাহা আমরা বুঝিতে কষ্ট পাই।"

'রেইস অ্যান্ড রাইয়ৎ' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখছেন—"একালের বিখ্যাত কন্যা কাদম্বিনী যাঁর কাছে সমাজের অনেক প্রত্যাশা ছিল, তিনি দুম করে বিয়ে করে বসলেন তাঁর চেয়ে অনেকটা অযোগ্য ব্যক্তিকে। অবশ্য এটা তাঁর এবং তাঁর আশাহত প্রেমিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা ভাঙন না দেখা দেয়।"... এই সংবাদের সঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতাও লিখেছিলেন।

এইভাবে বিতর্কের মধ্য দিয়ে কাদম্বিনীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা। এ ছিল এক দায়বদ্ধ দাম্পত্য। নারীদরদী দ্বারকানাথের অনুপ্রেরণায় কাদম্বিনীর পরবর্তী জীবন গড়ে উঠেছিল। মেয়েদের ডাক্তারি পেশায় আসার ক্ষেত্রে এই বিবাহের অবদান ছিল যুগান্তকারী।

চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা—বাধার মধ্যে অগ্রগতি

"দেবকী।... আমি ধন্বন্তরী হব কেমন করে?

সুরঙ্গমা। কেন চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ে।

দেবকী। (দীর্ঘশ্বাস সহকারে) পোড়া মেয়েমানুষের জাতকে পড়াবে কে?

সুরঙ্গমা। কেন তুমি কখন পড়তে চেয়েছ যে কেউ তোমায় পড়ায় নি। লোকে কথায় বলে যে ইচ্ছে থাকলে পথে পাওয়া যায়।

দেবকী। মেয়ে মানুষের সেই পথ কণ্টক।"

দ্বারকানাথের 'বীরনারী' নাটকের সংলাপ থেকে দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনীর মনোগত ইচ্ছার কথা জানতে পারি। কিন্তু সামাজিক অবস্থা তখনও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পক্ষে অনুকূল ছিল না। সমাজে মডেল নারী কেমন হবে এ ব্যাপারে ১৩০১ বঙ্গাব্দের

সৎসঙ্গ জানায়—'স্ত্রী শুদ্ধ হইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বামীকে প্রণাম করিবেন, পরে গোময় বা জল দ্বারা প্রাঙ্গণে মণ্ডল দিবেন। এই গৃহকার্য শেষ করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবেন। তদনন্তর সমুদয় গৃহকার্য (রন্ধনাদি) শেষ করিয়া পতিকে ভোজন করাইবেন, পরে অতিথির সেবা করিয়া চারিটি আহার করিবেন।"

এ থেকেই বোঝা যায় দ্বারকানাথ-কাদম্বিনীর লড়াই কত কঠিন ছিল।

কিন্তু এ সত্ত্বেও রক্ষণশীল সমাজপতিদের অনেকের মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার ব্যাপারে মৃদু সম্মতি ছিল। তার কারণ মেয়েরা চিকিৎসক হলে পুরুষ চিকিৎসকদের হাত থেকে নারীর তথাকথিত আব্রুকে নিরাপদে রাখা যাবে। এ ছাড়া তাঁরা মনে করতেন, 'নারীগণ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা না করিলে নারী জাতিসুলভ নানা প্রকার কঠিন পীড়ার সু-চিকিৎসা হইতে পারে না।'

কিন্তু বাধা এল অন্য দিক থেকে

১৮৮২ সালে কাদম্বিনী এফ এ পাশ করার পর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করেন। সেই আবেদন নাকচ হয় তিনি তখনও স্নাতক নন বলে। ১৮৮৩ সালে বি এ পাশ করার পর তিনি পুনর্বার আবেদন করেন। নিয়ম মতো তখন মেডিক্যাল কলেজে স্নাতক মাত্রেই পড়তে পারতেন। শিক্ষা দপ্তর মেয়েদের মেডিক্যাল পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। আপত্তি ছিল মেডিক্যাল কাউন্সিলের। ১৮৮৩ সালের ৪ঠা জুন ডি. পি. আই চিঠি পাঠালেন মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে। জানতে চাইলেন কাদম্বিনীর আবেদনের কী উত্তর দেওয়া হবে। মেডিক্যাল কাউন্সিল কিন্তু কাদম্বিনীর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির প্রশ্নে সম্মতি জানাল না।

এবার দ্বারকানাথ প্রমুখ নেতারা আন্দোলন শুরু করলেন। সম্ভবত এই আন্দোলনের ফলেই শিক্ষা দপ্তর আগ্রহী হয়ে উঠল। ডি. পি. আই. এবার সরকারের কাছে জানতে চাইলেন—কী উত্তর দেওয়া হবে এই মহিলাকে? ভবিষ্যতে ডাক্তারী পড়তে ইচ্ছুক মহিলাদের কিভাবে ফেরানো হবে?

জানা যায় এই ব্যাপারে বাংলার ছোটলাট রিভার্স অগস্টস টমসন হস্তক্ষেপ করেন। এরই ফলে ১৮৮৩ সালের ২৯ জুন সরকার মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নাকচ করে কাদম্বিনীকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির অনুমতি দেন।

১২৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আষাঢ় তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা জানায়—"গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে মেডিকেল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বি. এ. কে মেডিকেল কলেজে গ্রহণ করিয়াছেন।"

মেডিক্যাল কলেজের কাউন্সিলের মিটিং-এ এই ব্যাপারটি নিয়ে ঝড় উঠেছিল। ডাঃ কোটস্ এবং ডাঃ হার্ভে মেয়েদের সুযোগ দেওয়ায় পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু

অন্যরা এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু সরকারি আদেশ থাকায় কাদম্বিনীকে ভর্তি করার ব্যাপারটা সবাইকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু একজন বাঙালি অধ্যাপক কিছুতেই মানতে পারেননি। তিনি প্রকাশ্যে আপত্তি জানান। আপত্তির মূল কারণ ছিল নারী পুরুষ মেলামেশার ব্যাপারে সেই সময়ের সামাজিক বাধা। এছাড়া মেয়েদের সামনে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে শিক্ষাদান সেকালের পুরুষ শিক্ষকদের কাছে ছিল অস্বস্তিকর। সন ১৮৮৩, কাদম্বিনী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী হিসাবে প্রবেশ করলেন। পরিবেশ অনুকূল ছিল না। ছিল অধ্যাপকদের অসন্তোষ। এছাড়া ছিল একমাত্র ছাত্রী হিসাবে নানা অস্বস্তি। কিন্তু নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় নিয়ে কাদম্বিনী এগিয়ে চললেন। তিন বছর পাঠক্রমের পর এল ফার্স্ট এম বি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কাদম্বিনী মেটিরিয়া মেডিকা এবং অ্যানাটমিতে ফেল করেন। তাঁকে গ্রেস দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হয়। এই গ্রেস নম্বর দেওয়া নিয়ে কিছু সমকালীন সাময়িকপত্র আপত্তি জানায়—

"It is not proper to show grace to a particular sex in public examination"

—ভারতবাসী (২৮.৮.১৮৮৬)

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার মতে

''বাস্তবিক স্ত্রীলোকদিগের উপর এত অধিক অনুগ্রহ দেখাইলে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক অল্পই মিলিবে।"—সোমপ্রকাশ (১৯.৪.১৮৮৬)

সন ১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে কাদম্বিনী মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষা দেন। অন্য সব বিষয়ে পাশ করলেও তিনি মেডিসিনে ফেল করলেন। ডি. পি. আই. রিপোর্টে তাঁর পরীক্ষায় অসাফল্যের খবর পাওয়া যায়। তিনি এর পর একটি বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় পাশ করেন। এর পর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ তাঁকে জি. বি. এম. সি. বা গ্র্যাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ উপাধি দান করে প্র্যাকটিসের অধিকার দেন এবং ইডেন হসপিটালের চিকিৎসক নিযুক্ত করেন।

কাদম্বিনীর পুত্র প্রভাতচন্দ্রের মতে, মেডিক্যাল কলেজের একজন নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী বাঙালি অধ্যাপক তাঁকে অধীত বিষয়ের কার্যকরী জ্ঞানের পরীক্ষার সময় একটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নম্বর দেননি। কিন্তু এই ফেল করিয়ে দেবার কাহিনি অনেকে বিশ্বাস করেন না।

## চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথের উৎসাহে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত পাড়ি দেন কাদম্বিনী। তাঁর এক আত্মীয় প্রখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ তখন

বিলেতে থাকায় তিনি কিছু বাড়তি সুযোগ পেয়েছিলেন। চিকাগো বিশ্বমেলায় ভারতীয় মহিলাদের শিল্পকর্ম পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে কাদম্বিনী তাঁর পাথেয় সংগ্রহ করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় কাদম্বিনী মিস প্যাশ নাম্নী এক মহিলার সঙ্গিনী হয়ে বিলেত যাত্রা করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনী এডিনবরা থেকে এল. আর. সি. পি. ও এল. আর. সি. এস. এবং গ্ল্যাসগো থেকে এল. এফ. পি. এস. ডিগ্রি অর্জন করে ফিরে আসেন।

AN INDIAN LADY DOCTOR AT EDINBURGH—It gives us the greatest pleasure to announce that Mrs. Kadambini Ganguly has passed the Triple Qualification examination there (L. R. C. P. and L. R. C. S. Edinburgh and L. F. P. C. Glasgow.)—ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার (১৩.৮.১৮৯৩)

Glasgow-র ডিপ্লোমাটি হল L. F. P. S.। ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার ভুলবশত এর S-এর জায়গায় L. F. P. C. ছেপেছে।

## চিকিৎসক কাদম্বিনী

মেডিক্যাল কলেজ থেকে জি. বি. এম. সি. সার্টিফিকেট পাওয়ার পর কাদম্বিনী ইডেন হসপিটালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তাঁর বেতন ধার্য হয় তিনশো টাকা। শুরুতে কাদম্বিনী তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা পাননি। শোনা যায় তাঁকে দিয়ে ধাত্রীর কাজ করানো হত। ওয়ার্ডের একক দায়িত্বভার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডাক্তাররা অগ্রাধিকার পেয়েছেন। প্রতিবাদে কাদম্বিনী একটি খোলা চিঠি দেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বঞ্চনার ব্যাপারে সরব হয়েছিলেন।

জেনানা হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা ডাঃ ফোগো একমাসের ছুটিতে যান। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পাবার কথা কাদম্বিনীর, কিন্তু লোকাল কমিটির পছন্দ শ্রীমতী থোব। অবশেষে কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপে কাদম্বিনীর জয় হল।

কলকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করে কাদম্বিনীর কয়েকটি বিশেষ কীর্তি উল্লেখ করছি

১. ডাফরিন হাসপাতালে শিশু বিভাগ খোলার ব্যাপারে তিনি পথে নামেন এবং একাই প্রায় ২৪০০০ টাকা তুলে দেন।

২. শহরে শিশুমৃত্যুহার ঠেকাতে কটেজ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে কলকাতার হেলথ অফিসারকে চিঠি লেখেন।

৩. এই শহরে প্রথম ক্রেশ স্থাপনে তাঁর আগ্রহ ছিল।

নিজের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীমহলের সহানুভূতিহীনতার জন্য অর্ধেক কাজ তিনি করে যেতে পারেননি।

বিলেত থেকে ফিরে কাদম্বিনী ইডেন ফিমেল হসপিটালে আউটডোর ইন্‌চার্জ হিসাবে যোগ দেন। এর সঙ্গে ক্যাম্পবেল স্কুলে স্ত্রীরোগ পড়াবার দায়িত্ব পেলেন কাদম্বিনী। কাদম্বিনীই প্রথম মহিলা চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষিকা।

ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার ৮/৪/৯৪ তারিখে জানাল—

A LADY LECTURER IN THE CAMPBELL MEDICAL SCHOOL

This we believe, is the first instance of a lady being called upon to perform the honerous duties of a Medical lecturer in this country.

—ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার ৮/৪/৯৪

কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী আরো ভালো পদ তাঁর পাওয়ার কথা। কাদম্বিনী তাই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে মনোনিবেশ করলেন।

কাদম্বিনীর পসার জমে উঠল। ৫৭নং সুকিয়া স্ট্রিটে নিজের বাড়িতে তিনি প্র্যাকটিস করতেন। ১৮৯৫ বা ১৮৯৬ সালে নেপালের রাজমাতার চিকিৎসার ভার নিয়ে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন কাদম্বিনী। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাজপরিবার তাঁকে দেন প্রচুর অর্থ, দামী পাথর বসানো সোনার গহনা, মুক্তোর মালা, রুপোর বাসন, ভালো ভালো পোশাক, তামা, পেতল ও হাতির দাঁতের সুন্দর সুন্দর জিনিস এবং একটি বেঁটে গোলগাল সাদা রঙের টাট্টু ঘোড়া। বিভিন্ন রাজপরিবারের অন্দরমহলে তাঁর ডাক পড়ত। সাধারণ মানুষের কাছেও তাঁর চাহিদা ছিল অপরিসীম।

নারায়ণ দত্ত কাদম্বরীর চিকিৎসা জীবনের একটি কাহিনি শুনিয়েছেন যা কিংবদন্তি হয়ে বেঁচে আছে। একবার এক মহিলার পেটে টিউমারের জন্য তাঁকে কল দেওয়া হল। সেকালের বড়ো বড়ো স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা রোগীকে পরীক্ষা করে টিউমার ডায়াগনসিস করে গেছেন। কাদম্বিনী সযত্নে পরীক্ষা করে জানালেন টিউমার নয়, মেয়েটি গর্ভবতী। এরপর সারা কলকাতার ডাক্তার মহলকে তাক লাগিয়ে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তিনি নিরাপদে মেয়েটিকে প্রসব করান।

শেষের দিকে রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগী দেখা কমিয়ে দিলেও মৃত্যুদিন অবধি তিনি কাজ করেছেন।

অশালীন আক্রমণ, সম্মানহানি—প্রতিবাদ ও প্রতিকার

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে গিরিজাসুন্দরী নামে এক বিধবা খুন হন। ঘটনাটি ঘটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাড়ির সামনে। শোনা যায়, তাঁর ব্যর্থপ্রণয়ী এই খুন করেছিলেন। 'বঙ্গনিবাসী' পত্রিকা এই ঘটনার ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। এই নিবন্ধের কোনো কপি পাওয়া যায়নি। কিন্তু জানা যায় এই ঘটনার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ,

ব্রাহ্মসম্মিলনী, দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনীকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। কাদম্বিনীকে নটী বলে উল্লেখ করে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়।

পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হল। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রাহ্মদের পক্ষে ডাঃ নীলরতন সরকার, এবং কাদম্বিনীর পক্ষে দ্বারকানাথ— বিচারপতি ট্রেডলিয়নের এজলাসে মামলাটি ওঠে। 'বঙ্গনিবাসী' পত্রিকার পরিচালক মহেশচন্দ্র পালের পক্ষে আদালতে ওকালতি করেন তারকনাথ পালিত, গণেশচন্দ্র চন্দ্র ও মিঃ ডানি। গার্থ সাহেব দাঁড়ান ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে। আদালতে মহেশচন্দ্র প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। তিনি বললেন—দ্বারকানাথ বা কাদম্বিনীকে কোনরূপ আঘাত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ভুলবশত তেমন কিছু হলে তিনি দুঃখিত। বাদী চাইলে পত্রিকার পরের সংখ্যায় বিবৃতি ছাপার প্রতিশ্রুতি তিনি দেন। কিন্তু দ্বারকানাথ অনড় ছিলেন। বিচারে মহেশচন্দ্রের হয় ৬ মাস জেল, সঙ্গে ৫০্ টাকা অর্থদণ্ড।

কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাপিল করেও জেল খাটার হাত থেকে বাঁচতে পারলেন না মহেশচন্দ্র। বিচার হয় চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এ.পি. হ্যান্ডেলের আদালতে। দ্বারকানাথ ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন এক লাখ টাকা। আদালত তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেন। তার সঙ্গে দিতে হয়েছিল মামলার সব খরচ।

পরিমল গোস্বামীর স্মৃতিচিত্রণ থেকে জানতে পারি আরও একটি পত্রিকাতেও কাদম্বিনীকে কটাক্ষ করে একটি বিশ্রী কার্টুন প্রকাশিত হয়। নারায়ণ দত্ত জানান—"কার্টুন সম্বন্ধে শোনা যায়, সেটি নাকি ধূমপানরতা কাদম্বিনীর ব্যঙ্গচিত্র।" পরিমল গোস্বামী তাঁর স্মৃতিচিত্রণ-এ লেখেন—

"প্রভাতচন্দ্রের পিতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর ধর্মে আঘাত দিয়েছিলেন এক কাগজের সম্পাদক। তাঁর ধর্ম ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসার। সেই সম্পাদক দ্বারকানাথ ও তাঁর প্রচেষ্টাকে কার্টুন ছবির সাহায্যে বিদ্রূপ করেছিলেন। দ্বারকানাথ উত্তেজিতভাবে লাঠি নিয়ে সম্পাদকের বৈঠকে গিয়ে হাজির; পকেটে তাঁর সেই কাগজের বিদ্রূপাংশ। সেটি পকেট থেকে বের করে সম্পাদকের মুখে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন— 'Eat your words'—'Eat your words.'

বলেছিলেন আর লাঠি দিয়ে তার মুখে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছিলেন।...

দ্বারকানাথ ওই সম্পাদকের কথা প্রথমে আহার করিয়েছিলেন এবং পরে তাঁকে দিয়ে প্রত্যাহার করিয়েছিলেন।"

পরিমল গোস্বামী কাগজটির নাম জানাননি। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ডাক্তার কাদম্বিনীর চলার পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। দ্বারকানাথ-কাদম্বিনী এই বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে।

## রাজনীতি ও সমাজসেবা

কাদম্বিনী শুধু একজন চিকিৎসকমাত্র ছিলেন না। দ্বারকানাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনে দ্বারকানাথের ছিল বিশেষ উৎসাহ। জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর দ্বারকানাথ মেয়েদের ডেলিগেট করার দাবি নিয়ে আন্দোলন করেন। এর ফলে ১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে কংগ্রেসের যে পঞ্চম অধিবেশন হয় তাতে ছয়জন মহিলা ডেলিগেটরূপে মনোনীত হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন দ্বারকানাথের পত্নী কাদম্বিনী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী ঘোষাল। পরের বছর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মহিলাদের প্রস্তাব উত্থাপন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার স্বীকৃত হয়। কলকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে কাদম্বিনীর ওপর সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই ঘটনায় নারী আন্দোলনের একটি নবপর্যায় উন্মোচিত হল। অ্যানি বেসান্ত তাঁর 'How India wrought for her freedom' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে লেখেন—

"One of the delegates Mrs. Kadambini Ganguly was called on to move the vote of thanks to the chairman, the first woman who spoke from the Congress platform, a symbol that India's freedom would uplift India's Womanhood."

কলকাতায় ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেনরি পোলক। ট্রান্সভালে সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাদম্বিনী ছিলেন এই সভার প্রথম সভানেত্রী। গান্ধীজির সত্যাগ্রহের সমর্থনে তিনি কলকাতার রাস্তায় সভা করেছেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে যে মহিলা সম্মেলন আয়োজিত হয়, কাদম্বিনী সেই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

কয়েক বছর তিনি ব্রাহ্মসমাজের জেনারেল কমিটি এবং কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন।

সন ১৯২২ খনিতে মজুরনীদের কাজ বন্ধ করার প্রস্তাব হলে কাদম্বিনী ও শ্রীমতী কামিনী রায় বিহার ও ওড়িশা প্রদেশের কোনো কোনো খনি ঘুরে এসে নিজেদের মতামত জানান।

কাদম্বিনী সকল দেশের নারীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ প্রচেষ্টায় সমর্থক ছিলেন।

## ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন

কাদম্বিনী সুখী দাম্পত্য এবং পারিবারিক জীবনযাপন করেছেন। তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল বছর পনেরো-ষোলো। আট সন্তানের জননী হয়েছিলেন তিনি। শেষ মেয়েটি অল্প বয়সে মারা যায়।

মৃত্যুপথযাত্রী দ্বারকানাথের যেভাবে তিনি সেবা করেন তা দেখে ডাঃ বার্চ বিস্মিত হন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর ২৪ বছর বেঁচেছিলেন কাদম্বিনী। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করিয়েছেন। মানুষ করেছেন। মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। সাংসারিক সকল কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। ছিলেন দক্ষ সূচিশিল্পী।

## প্রয়াণ

১৯২৩ সালের ৩রা অক্টোবর প্রয়াত হলেন কাদম্বিনী। শেষদিকে রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি রোগী দেখা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সফল চিকিৎসকের জীবনে ছুটি আসে জীবনের শেষ দিনে।

নারায়ণ দত্ত জানিয়েছেন—শেষের সেই দিনও রোগী দেখেছিলেন, শুধু তাই নয় একটি জটিল অপারেশনও করেছিলেন।

শোনা যায়, শ্রান্ত দেহে ফিরে এসে পুত্রবধূ সরলাকে বলেন, "বউমা লোকে বলতে শুরু করেছে ডাঃ গাঙ্গুলি নাকি বুড়ো হয়ে গেছেন, তাঁর হাত আর আগের মতন চলে না। আজ যে অপারেশন করে এলাম সেটা দেখলে তারা আর একথা বলতে সাহস করবে না।" এর অল্প পরেই তিনি মারা যান। সেরিব্রাল স্ট্রোকই সম্ভবত মৃত্যুর কারণ।

## উপসংহার

জীবনকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কাদম্বিনী। প্রথম জীবনে পিতা ব্রজকিশোর, যৌবনকালে দ্বারকানাথ তাঁর জীবনের গতিপথে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আত্মশক্তিতে এতখানি বলীয়ান হওয়া। এই আত্মশক্তি তাঁকে সাহায্য করেছে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে, জাতিভেদ অগ্রাহ্য করে নিজের পছন্দমত পাত্রকে বিয়ে করতে। সহশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাংলার প্রথম মহিলা চিকিৎসক হবার বিরল সম্মান তিনি অর্জন করেছেন। চাকরির পাশাপাশি করেছেন প্রাইভেট প্র্যাকটিস। উচ্চশিক্ষা নিতে জাহাজে করে পাড়ি দিয়েছেন অচেনা অজানা দেশে। কোনো কুৎসা, কোনো অপবাদ তিনি সহ্য করেননি। তাঁর স্বামী ও তিনি দোষীকে উচিত শাস্তি দিয়ে তবে ছেড়েছেন। পুরুষশাসিত যে সমাজ নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা না দিতে ভীষণ ব্যস্ত, সেখানে কাদম্বিনী লড়াই করে মানুষের প্রাপ্য সমস্ত মর্যাদা একটি একটি করে আদায় করে নিয়েছেন। এরই পাশাপাশি স্বামী দ্বারকানাথের অনুপ্রেরণায় তিনি হয়েছিলেন—জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক ও মানবদরদী।

এমন একজন ব্যতিক্রমী নারীই তো হতে পারেন সব দিক দিয়ে আজকের মেয়েদের আদর্শ। এইখানেই সার্ধশতবর্ষ পরেও তাঁকে স্মরণ করার সার্থকতা।

তথ্যসূত্র


১. বাংলার নারী-জাগরণ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৭।
২. কালজয়ী কাদম্বিনী ও তাঁর কাল ডঃ সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১২।
৩. মহিলা ডাক্তার ভিনগ্রহের বাসিন্দা চিত্রা দেব, কলকাতা, ১৯৯৪।
৪. উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি : সম্পাদনা স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, কলকাতা, ২০০৩।
৫. সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড সংকলন ও সম্পাদনা স্বপন বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা, ২০০৩।
৬. কাদম্বিনী—'হরিণ নয়না' : সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতৃশক্তি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১২।
৭. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
৮. অনির্বচনীয়া নারায়ণ সান্যাল, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৯।

# সংবাদ-সাময়িকপত্রে কাদম্বিনী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা প্রদান করিবার অধিকার দেওয়ায়, এ বৎসর একটি কুলকন্যা প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। পরীক্ষার্থিনী কুমারী কাদম্বিনী বসু, বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক বাবু ব্রজকিশোর বসুর কন্যা। এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি ছাত্রী মাইনার এবং একটি ছাত্রী বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের একজন কামিনী সেন, জলপাইগুড়ির মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা, দ্বিতীয়জন অবলা দাস হাইকোর্টের উকিল বাবু দুর্গামোহন দাসের দ্বিতীয় কন্যা। অপর দুইজন—কুমারী সুবর্ণপ্রভা বসু ও লাবণ্যপ্রভা বসু, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যা। কুমারী লাবণ্যপ্রভা ব্যতীত আর সকলেই বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বর্ত্তমান বেথুন স্কুলের ছাত্রী। লাবণ্যপ্রভা গৃহে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দিয়াছেন।

অবলাবান্ধব, অগ্রহায়ণ ১২৮৫।

* * *

Kumari (Miss) Kadambini Bose, daughter of Babu Brojokishore Bose, Teacher, Berhampore College, intends to go up this year for the Entrance Examination. She has already sent the usual fee. She is a pupil of Banga Mohila Bidyaloya, now amulgamated with the Bethune School. She has passed, we hear, satisfactorily the preliminary Examination held by the teachers of the school, the papers set to her being those by which students of another school going up for the same examination were also examined. If sickness or other physical disability does not supervene, she is sure to appear at the examination. We wish her every success.

—ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন,
২১.১১.১৮৭৮।

*

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে ১৭ বৎসর মাত্র। গত বৎসর ইঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে পড়ার অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এ বৎসরে এই বিদ্যালয় হইতে তিনটি বালিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ও মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদিগের বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে।

—সোমপ্রকাশ, ২০.১.১৮৭৯।

* * *

In noticing the success of Kumari Kadambini Bose at the last University Entrance Examination, our friends of the Sunday Mirror seemed to have ignored some important facts which we know, were within their knowledge. Firstly, that the young lady was a student of Banga Mohila Bidyaloya now amulgamated with the Calcutta Bethune School and secondly, that she is a daughter, not of Babu Brojokissore Ghose, but of Babu Brojokissore Bose, a teacher in the Berhampore Collegiate School. The success of the young lady does honor both to the managers of the school to which she now belongs, as well as to herself and her country-women and we hope her example will be largely followed. She obtained 199 marks and failed to pass in the first division for one mark.

—ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন,
২৩.১.১৮৭৯।

*

শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু বর্ত্তমান বর্ষের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গীয় রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। পাঠকগণ যথাকালে এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন। ইনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে শ্রীমতী কাদম্বিনীর উত্তীর্ণ সংবাদ দিয়া বলেন যে, এক নম্বরের জন্য ইনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ডিরেক্টরের পত্র পাইয়া পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীমতী কাদম্বিনীর উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য তাঁহার নিমিত্ত মাসিক ৫ টাকা হারে দুই বর্ষের জন্য একটি জুনিয়র বৃত্তি স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। কাদম্বিনী যদি দুই বৎসর ডিরেক্টরের আজ্ঞামত বিদ্যালয়ে পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। ইহা ব্যতীত সার আসলি ইডেন কাদম্বিনীর পাঠ সৌকর্য্যার্থ ৫০ টাকা মূল্যের পুস্তক দান করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অপর ডিরেক্টরের

আজ্ঞামত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরকাল এফ. এ. না পড়িলে বৃত্তি পাইবেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে শ্রীমতী কাদম্বিনী এক্ষণে কোন্ বিদ্যালয়ে পড়িবেন? যুবকদিগের সহিত কোন কলেজে পাঠ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অন্য বিদ্যালয়ই বা কোথায়?

—সংবাদ প্রভাকর। ৮.২.১৮৭৯।

* * *

Miss. Kadambini Bose's success at the last University Examination has already attracted public attention. The marked manner in which the Government of Bengal, at the instance of the Director of Public instruction, has resolved to signalise her success viz, by awarding a scholarship of Rs. 15 a month tenable for two years, and a present of books to the value of Rs. 50, will not fail to have a very salutary effect upon our countrymen. It wile, we are sure prove a very strong incentive both for the girls to study hard and for the parents to educate their girls for such examinations. We cannot be sufficiently thankful to Sir Ashley Eden and Mr. Croft, for the prompt way in which notice has been taken of Miss Bose's success. For this not alone Sir Ashley and Mr. Croft will live for ever in the memory of Bengal. We hope with all these scholarships and prizes the Bethune School will prove a centre of attraction for Bengali girls.

—ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন,
১৩.২.১৮৭৯।

* * * *

With regard to the statement that Miss Kadambini Bose is the first Native lady who has entered the Calcutta University, a correspondent of the Englishman, wanted to make out that Miss Chundra Mookhi Bose was really the first and Miss Kadambini is the second. Our esteemed contemporary of the Hindu Patriot seems also to have endorsed this opinion. But it is really a mistake to say that Miss Chundra Mookhi Bose passed the Entrance Examination. If we are not mistaken, she passed an examination equivalent to the Entrance Examination, but when she passed, the rules for admitting ladies to the University had not been promulgated. It was, infact her success, that led to the passing of the rules. No doubt it is a distinction with-

out difference, but yet we think both the Director of Public Instruction and the Government of Bengal were literary correct in stating that Miss Kadambini Bose was the first young Native lady who passed the Entrance Examination. It is not our object in any way to detract from the merit which justly due to Miss Chundra Mookhi Bose. Although she belongs to a different religious persuation from us, yet she is a Bengali, and we are justly proud of her. We may as well take hold of this opportunity to urge upon the Committee of the Bethune School, the claims of our Native Christian sisters. We do not see any reason, why they should not be admitted freely into the Boarding Department. They are as much casteless (if we may use the word) as the Brahmos. Miss Chundra Mookhi Bose would have this year gone up to the First Arts Examination, if she could prosecute her studies in some institution upto that standard. We would therefore strongly urge upon the Committee to apply for an additional grant, to get competent teachers, to open college classes and to admit Native christian girls to the School.

—ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন,
২০.২.১৮৭৯।

* * * *

We are exceedingly glad to learn from the announcement made by the Viceroy at the Bethune School last week that kumar Rajendra Narain Roy, son of Rajah Kali Narain Roy, deceased, of Joydebpoor in the District of Dacca, has come forward with a prize of Rs. 50, and a gold medal for a like sum to be awarded to Miss Kadambini Bose who has passed the Entrance Examination from the school. We wish Kumar will endow the school with a parmanent scholarship of Rs. 10 or 15 a month, to be styled the Kali Narain scholarship in Commemoration of his father's memory. We hope the young Kumar's example will be followed by our wealthy countrymen of East Bengal specially and we are sure persons enjoying the wealth of Nawab Khaej Abdul Gunny and his talented son; Mohini Mohon Dass, Roop Lall Raghunath of Dacca, the Roys of Bhagyacool and the Paul Chowdhrys of Lohajong, may each one of them without least difficulty, found a scholarship for successful female candidates at the Entrance Examination from whatever place or school they may

go up for the Examination. They will then give a great impetus to the cause of female education.

—ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন,
৬.৩.১৮৭৯।

*

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান

রমণীদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদান করিতে দিবার স্বত্ব দেওয়ায় এই বিদ্যালয়ে নব প্রবিষ্ট ছাত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কেবল এক সংখ্যার জন্য প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। মান্যবর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুই বর্ষের কারণ একটি বৃত্তি দান করিয়াছেন, এবং ৫০ টাকা মূল্যের পুস্তক দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আরও ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে সকল ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইবে, তাহারা মাসিক ১৫ টাকা হারে দুই বর্ষ বৃত্তি পাইবে। বেথুন বিদ্যালয়ের অন্যান্য অনেক ছাত্রী যথেষ্ট সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৪ বর্ষ বয়স্কা ছাত্রী শ্রীমতী কামিনী সেন মধ্যম শ্রেণীর ইংরাজি ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। কলিকাতায় ১৬ জন তাঁহাপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছাত্র এই পরীক্ষা দেয়। ইহার মধ্যে কামিনী অনুবাদে সর্ব্বপ্রথম, ইতিহাসে দ্বিতীয়, ভূগোলে প্রথম, গণিতে চতুর্থ, এবং সাধারণ্যে চতুর্থ হইয়াছেন। অপর এক ছাত্রী শ্রীমতী অবলা দাসী যিনি ঐ পরীক্ষা দেন তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং শ্রীমতী সুভামা বসু যিনি বাঙ্গালা ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষা দেন, তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বোর্ডিং বিদ্যালয় ব্যতীত দৈনিক বিদ্যালয়েরও দিন দিন ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুর শিক্ষার কারণ কমিটি—কলেজ বিভাগ স্থাপন করিতেছেন। বিজ্ঞাপনী পাঠ সমাপ্ত হইলে কুমারী লিটন স্বহস্তে পুস্তক এবং প্রশংসনীয় পত্র পুরস্কার দান করেন। তৎপরে লর্ড লিটন বাহাদুর গাত্রোত্থান করিয়া মনোহর বক্তৃতা করেন। লর্ড লিটনের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ বেথুন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধিস্বরূপ লর্ড বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে ৭টার সময় সভাভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গকালে ছাত্রীগণ আর একটি সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন।

—সংবাদ প্রভাকর, ৬.৩.১৮৭৯।

* * * *

## THE BETHUNE SCHOOL

Now that collegiate classes are being opened, Miss Kadambini Bose should commence her studies at once, we do not know what arrangement has been made. It will take some time for a competent mistress to be brought from England. Miss Mannings should at once be written to. Pending the arrival of a mistress from England we think some arrangement should at once be made. Babu Shoshi Bhusan Dutt should be sent from the Cuttack College to teach Literature, History, Mental and Moral Philosophy. He has been teaching Literature in the second year class and the result has been very satisfactory. We think Mr. Kroft knows him well too. He is a gentleman upon whom the parents of the pupil have got great confidence. The mathematics may, for the present, be left to Baboo Aditya Coomar Chatterjee, who is now taking mathematics for the Entrance class. He is a B. A. of the University and so far as we know in quite competent to teach the first year class in mathematics. Babu Ambica Churan Sen may be sent for from the Krishnanagar College to teach Physial Sciences and Chemistry. College classes may efficiently be managed at about Rs 300 per month.

—ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন,
৬.৩.১৮৭৯।

* *

কুমারী কাদম্বিনী ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেথুন স্কুলে কলেজ শ্রেণী খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া কটক কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক বাবু শশীভূষণ দত্ত, এম. এ.-কে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। বেথুন স্কুলে এখন শিক্ষক প্রভৃতির সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসে ৭৫০ টাকা দান করিতেছেন।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১২৮৬।

* *

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বালিকাগণ নিম্নলিখিত পরীক্ষাসকল দিয়াছেন ইহাঁরা সকলেই কুমারী। চন্দ্রমুখী ও নির্ম্মলা ফ্রি চার্চ্চ মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের, তদ্ভিন্ন সকলেই বেথুন স্কুলের ছাত্রী।

| নাম | পরীক্ষা |
|---|---|
| কাদম্বিনী বসু | ফার্স্ট আর্টস |
| চন্দ্রমুখী বসু | ঐ |
| কামিনী সেন | এনট্রান্স বা প্রবেশিকা |
| অবলা দাস | ঐ |
| সুবর্ণপ্রভা বসু | ঐ |
| নির্ম্মলা মুখোপাধ্যায় | ঐ |

—বামাবোধিনী পত্রিকা, জানুয়ারী ১৮৮১।

* * *

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ফ্রি চার্চ্চ মিশনের কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এবং বেথুন বিদ্যালয়ের কুমারী কাদম্বিনী বসু প্রথম আর্টস পরীক্ষায় ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বেথুন বিদ্যালয়ের কুমারী কামিনী সেন ও সুবর্ণলতা বসু ১ম ও ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কামিনী সেন ১ম শ্রেণীর ২০ টাকা এবং সুবর্ণপ্রভা ২য় শ্রেণীতে ১৫ টাকা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৮৮১।

His Honour the Lieutenant Governor of Bengal has authorised the opening of First Arts classes in the Bethune Girls School at Cornowalis square. At present a native lecturer will be entertained for the purpose of giving instruction to Miss Kadambini Bose in all subjects of her examination. A qualified European lady is shortly expected from England to take charge of the instiuttion and introduce the system of instruction according to the F. A. Course of the University.

—দ্য ইংলিশম্যান, ২৩.৫.১৮৭৯।

Persuant to notice a convocation for coferring degrees was held on Saturday last at 4 P.M. in the Senate House, College Square. The Assembly was, perhaps, the largest that has gathered on these occassion, but singularly enough the police arrangments were the very worst. Though we saw several European Constables in the hall, there was no attempt made by them to maintain order or quiet, and the address of the Vice-chancellor was positively in anclible

amidst the hum of voices of some hundreds of the most ill-mannered native school boys, who had forced their way into the hall. The convocation of 1883 will long be remembered as the occassion on which two young ladies of the Bethune Female School, Miss Chandramukhi Basu and Miss Kadambini Basu took the B. A. degree; and we believe, it was to witness them receive their certificates that there was an unusually large gathering. As the young ladies were conducted to the Vice-chancellor, the hall resounded with cheers, in which His Honour the Lieutenant Governor and Hon'ble Mr. Ilbert, who were present and who occupied seats on the dias to the right and left of the Vice-chancellor, also joined...

—দ্য ইংলিশম্যান, ১৩.৪.১৮৮৩।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় এই বৎসর দুইজন মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কুমারী কাদম্বিনী বসু এবং কুমারী চন্দ্রমুখী বসু। পাঠকবর্গ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আগামী বৎসর সম্ভবতঃ তাঁহারা এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। লিবারেল বলিয়াছেন এখন যেমন ব্যাকরণের মাথায় আঘাত করিয়া তাঁহাদিগকে Bachelor of Arts বলা হইতেছে তখনও কি তাঁহাদিগকে Master of Arts বলা হইবে? যাহা হউক উভয় কুমারী ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্থান অধিকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ভারতবর্ষের ভাগ্যে মহিলা গ্রাজুয়েট এই প্রথম হইল। কুমারীদ্বয় দীর্ঘজীবী হয়েন ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।

—পরিদর্শক, ৪. ২. ১৮৮৩।

সম্পাদকীয় উক্তি

এবারকার বি. এ. পরীক্ষাতে কুমারী কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যে ইহারাই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হইলেন। কুমারী কাদম্বিনীর নিবাস বরিষালের অন্তর্গত চাঁদসী গ্রামে। ইহার পিতা ব্রজকিশোর বাবু বহরমপুর কালেজের শিক্ষক। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ ইহার পিসতাত ভ্রাতা। এই রমণীরত্ন পূর্ব্ববঙ্গের রমণী সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

—ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ, ফাল্গুন, প্রথম পক্ষ, ১২৮৯।

ভারতেতিহাসের সর্ব্বপ্রথম মহানন্দকর এই ঘটনাটি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক—গত ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদান মহাসভায় কুমারী কাদম্বিনী বসু ও কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বি. এ. উপাধিদ্বারা ভূষিত হইয়াছেন। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনার্থ বহুলোকের জনতা হইয়াছিল, ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক মহিলাও সভাস্থলে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী এদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এবং এদেশীয় নারীজাতীর অগ্রণী হইয়া তাহাদিগের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহারা আরও বিদ্যোন্নতির পরিচয় দিয়া আমাদিগের আশা ও আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, এপ্রিল ১৮৮৩।

বি. এ. উপাধিধারিণী শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। শুনিলাম এই বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু র‍্যাংলার, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত বি. এ, শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন বাবুপ্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিবাহসভায় উপস্থিত হন নাই। শুনা যায় দ্বারিবাবু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি। অথচ তাঁহার বিবাহে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সভ্য ও প্রচারকগণ উপস্থিত রহিলেন না। কেন যে উপস্থিত রহিলেন না তাহা আমরা বুঝিতে কষ্ট পাই।

পরিচারিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

বি. এ উপাধিধারিণী কাদম্বিনী বসুর সহিত ভারতসভার সহকারী সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহটী ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ব্রাহ্ম মতে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

—এডুকেশন গেজেট, ১২. ৬. ১৮৮৩।

On the 12th instant, Miss Kadambini Bose, B. A. was married to Babu Dwarakanath Ganguly. The Brahmo Public Opinion says : Babu Dwarakanath is a widower, a Brahmin by caste and aged about 39, Miss Kadambini, the eldest daughter of Babu Brojo Kishore Bose, teach Berhampur College by caste a Kayastha, is aged about 22. The marriage was registered according to Act-III of 1872. The service

was conducted by Pandit Ramkrishna Vidyaratna. A large number of friends including European ladies and gentlemen were invited and came to see the ceremony which was very interesting.

—বেঙ্গলী, ২৩.৬.১৮৮৩।

*

শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (বসু?) বি. এ. কলিকাতার মেডিকেল কালেজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। মেডিকেল কালেজের অনেক শিক্ষক কয়েকটি প্রধান কারণ দর্শাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে উক্ত কালেজে প্রবিষ্ট করিবার সম্বন্ধে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, উক্ত কালেজে ছাত্রদিগের রাত্রিতে যখন কালেজে থাকিতে হয়, তখন দুইজন করিয়া ছাত্র একঘরে থাকে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক কিরূপ করিয়া পুরুষের সহিত এক ঘরে থাকিবে। এবং যখন ছাত্রদিগকে পুরুষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বুঝাইয়া দিতে হয়, তখন পুরুষ শিক্ষক স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপে উহা বুঝাইয়া দিবে। আরও অন্যান্য আপত্তির মধ্যে উক্ত কালেজের একজন ছাত্র বলেন যে, নিয়ম আছে সমস্ত বক্তৃতাতে উপস্থিত না থাকিলে, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এবং যদি এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন রমণীর গর্ভ হয়, তবে প্রসবকালিন তিনি কি করিয়া বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিবেন? আপত্তি কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত। আমাদিগের বিবেচনায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২. ৭. ১৮৮৩।

*

শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু বি. এ. চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট, ৬.৭.১৮৮৩।

* *

শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকাল কলেজে ৫ বৎসর কাল অধ্যয়ন জন্য মাসিক ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি যে এক বৎসর পড়িয়াছেন, তাহারও জলপানী পাইবেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট সাহেবের বিশেষ যত্নে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, আগষ্ট, ১৮৮৪।

*

শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু বি. এ, এম. বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। মিরার বলেন স্ত্রীলোকদিগের জন্য পরীক্ষা কিছু সহজ হওয়া আবশ্যক। নিম্ন পরীক্ষাগুলিতে

স্ত্রীলোকগণকে অধিক অনুগ্রহ করা হয় বলিয়া উচ্চ পরীক্ষাতেও সেইরূপ করিতে হইতে তাহার কোন কথা নাই। বাস্তবিক উচ্চশিক্ষায় স্ত্রীলোকদিগের উপর এত অধিক অনুগ্রহ দেখাইলে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক অল্পই মিলিবে।

—সোমপ্রকাশ, ১৯. ৪. ১৮৮৬।

শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবার কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ১ম এম. বি বা তৃতীয় বার্ষিকী পরীক্ষা দেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তাহার পরীক্ষাদান কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় নাই। শ্রীমতী মেটিরিয়া মেডিকা এবং এনাটমিতে ফেল হন। এখন শুনিতেছি, সিণ্ডিকেট সভার দয়ায় তিনি এ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন। বঙ্গবাসী।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩. ৮. ১৮৮৬।

* *

The Bharat Basi of the 28th August can not approve the action of the Syndicate of the Calcutta University in passing, by an extention of grace, Mrs. Ganguly, the first female medical student of Bengal for special reasons. As far as the writer is aware, she has been passed only because she is a female. It is not proper to show grace to a particular sex in public examination.

ভারতবাসী, ২৮.৮.১৮৮৬।
(রিপোর্ট অন নেটিভ পেপার্স, ৪.৯.১৮৮৬।)

* *

স্ত্রী ডাক্তার—আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ৩০০ টাকা বেতনে লেডী ডাফরিণের স্ত্রী হাঁসপাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ডাক্তারী কাজ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ পান নাই।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, আগষ্ট ১৮৮৮।

* *

MRS GANGULY B. A., G. M. C. B
can be Consulted at her residence, 45-5, Beniatola Lane, College Square, Calcutta, Terms Moderate.

—দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ১৭.১০.১৮৯০।

* *

বঙ্গনিবাসীর নামে নালিশ হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী

ও বাবু নীলরতন সরকারদ্বয় এবং নিজ পক্ষ হইতে বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি এই নালিশ রুজু করিয়াছেন। উক্ত পত্রে সাধারণ সমাজের নানা কলঙ্ক কেলেঙ্কারির কথা এবং গাঙ্গুলি মহাশয়ের স্ত্রীকে নাকি নটী বলা হইয়াছিল, তাই এই অভিযোগ। মকর্দ্দমা এখন বিচারাধীন। আগামী ২০শে বৈশাখ শনিবার ঐ মকর্দ্দমার শুনানী হইবে।

—অনুসন্ধান, ১৫ই বৈশাখ, ১২৯৮।

* * *

## বঙ্গনিবাসী ও শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও বঙ্গনিবাসী সম্পর্কীয় মকদ্দমা এখনও নিষ্পত্তি হইল না, ইহা বড়ো লজ্জার কথা। লজ্জা আমাদের বিবেচনায় যে কেহ এক পক্ষেরই তাহা নহে। বঙ্গনিবাসী অধ্যক্ষগণেরও যতদূর কলঙ্ক শ্রীমতী কাদম্বিনীরও ততদূর। গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্ত্রীর কলঙ্ক এই জন্যই বলি যে বাঙ্গালী ঘরের স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক যথার্থ না হইলেও কাগজপত্রে লেখালিখি, সেই কথাটা লইয়া ঘরে ঘরে আন্দোলন বড়ই লজ্জার কথা ও দুঃখের কথা। আজি কতদিন হইল শ্রীমতী বঙ্গনিবাসীর অধ্যক্ষগণের উপর নালিশ করিলেন, অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র পাল মকদ্দমায় পরাস্ত হইয়া ছয় মাস জেলে গেলেন, এ সকল ত একপ্রকার চুকিয়া বুকিয়াই গেল তবে আবার তাহা লইয়া বেশী আন্দোলন বা আলোচনা কেন? মানহানী করিলে ক্ষতিপূরণ করিয়া লওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু যে সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণ করিবার মকদ্দমা তাহা বাঙ্গালীর ঘরে বড়োই গোপনীয় ও লজ্জার কথা সুতরাং আমাদের বিবেচনায় গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্ত্রী যাহাতে শীঘ্রই ইহা মিটমাট হইয়া যায় তাহাই করা কর্ত্তব্য। ফৌজদারি আদালতে একবার মান রক্ষা হইয়াছে, এবার দেওয়ানী আদালতেও না হয় সম্ভবতঃ তাহা রক্ষা পাইবে কিন্তু তাহাতে এক অভিনয়ের পর আবার দ্বিতীয় অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। সাধারণের পক্ষে তাহা কেবল একটা তামাশার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। এ অবস্থায় যাহাতে শীঘ্র আপনা আপনি মিটিয়া যায়, উভয়েরই তাহা করা কর্ত্তব্য। আমরা শুনিলাম বঙ্গনিবাসীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল যাহাতে আপোষে মিটিয়া যায়, তাহার জন্য গাঙ্গুলী গৃহিণীর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন শীঘ্র শীঘ্র মিটমাট হইয়া গেলে উভয়েরই পক্ষে মঙ্গল।

—সংবাদ প্রভাকর, ২৮.৫.১৮৯২।

চিকাগো প্রদর্শনীতে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যাইতেছেন। তথায় স্ত্রী-লোকদিগের শিল্পকার্য্য প্রদর্শনার্থ একটা স্বতন্ত্র সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি স্ত্রী-ইঞ্জিনিয়ার ইহার প্ল্যান (মূল নক্সা) করেন, ইহার ভিতরের সজ্জা স্ত্রীলোক দ্বারা প্রস্তুত এবং

ইহার তত্ত্বাবধানের ভার মহিলা সমিতির উপর আছে। চিকাগোর বিবি পটার পামার ইহার অধ্যক্ষ।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩।

It is highly gratifying that our learned lady doctor Srimati Kadambini Ganguly will shortly start for Chicago to be present at the great exhibition and help in making exhibit of the handwork of Indian ladies. She also intends to reside in the United States for sometime and compete for Medical degrees of the American Universities, while we wish her all success, we earnestly hope she will be the means of uniting the sisters of the New World with those of India.

—বামাবোধিনী পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩।

*

ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নিরাপদে ইংল্যাণ্ড পৌঁছিয়াছেন। তিনি তথা হইতে আমেরিকায় যাইবেন।

Mrs. Kadambini Ganguly has reached England and will thence shortly proceed to America to be present at the Chicago fair.

বামাবোধিনী পত্রিকা, এপ্রিল, ১৮৯৩।

AN INDIAN LADY DOCTOR AT EDINBURGH —It gives us greatest pleasure to announce that Mrs. Kadambini Ganguli, now studying at Edinburgh, has passed the triple Qualification Examination there (L. R. C. P. and L. R. C. S., Edinburgh, and L. F. P. C., Glasgow).

—দ্য ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার, ১৩.৮.১৮৯৩।

[বিঃ দ্রঃ—গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিটি L. F. P. S. (Licensiate of Physicians and Surgeons), পত্রিকায় ভুলবশত L. F. P. C. লেখা হয়েছে।]

## স্ত্রী-ডাক্তার

শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এডিনবরা নগরে এককালে তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন শুনিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম। তিনি এডিনবরা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল. আর. সি. পি. এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরও দুইটি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৮৯৩।

* *

ডাঃ শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গ মহিলাদিগের প্রস্তুত যে সকল শিল্পজাত সঙ্গে লইা গিয়াছিলেন তদ্দর্শনে ইংলন্ডের রাজ পরিবারের মহিলাগণ প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রিন্সেস্ ক্রিশ্চিয়ানো সেগুলি চিকাগোতে পাঠাইবার সাহায্য করিয়াছেন।

—বামাবোধিনী পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১৮৯৩।

* *

Kadambini Ganguly had returned to Calcutta on 16th November 1893.

—বামাবোধিনী পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৮৯৩।

* *

We notice with great pleasure that Mrs. Kadambini Ganguly is an applicant for the post of Lady Superintendent of the Lady Dufferin Hospital of Calcutta, rendered vacant by Miss. Hamilton having been called away to Kabul. Mrs. Ganguly's credential are of highly eulogistic character and we have no doubt her application will meet with favourable consideration at the hands of the authorities it so well deserves. After graduating in Arts at the Calcutta University Mrs. Ganguly received a sound medical education and three times officiated for Mrs. Foggo as Lady Superintendent of Lady Dufferin Hospital giving her official superiors every satisfaction in the discharge of her difficult duties. She had considerable practice at Calcutta when she went to England last year and having passed the triple Qualification examination of the Royal College of Surgeons and Physicians of Edinburgh and of the Licenciates of Midwifery Edinburgh and Glasgow, she qualified herself for the British Register, she holds testimonials from four distinguished authorities like Dr. Byrham Branwell, Dr. Little John and Dr. Sampson and Lady Dufferin addressed her a flattering letter during her stay in England in which her ladyship assured her that Indian ladies qualified as Mrs. Ganguly was, would be always considered with great favour and would always command good appointments. Her ladyship added that there was every disposion in India to employ them, and in England they were most anxious to help them. Now that there is an excellent oppertunity we trust that Indian authorities will give practical dem-

onstration of their appreciation of the worth of talented medical woman like Mrs. Ganguly.

—দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ২০.৩.১৮৯৪।

* *

Kadambini Ganguly had been placed in charge of the outdoor patients of the Eden Hospital.

—দ্য ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার, ২৫.৩.১৮৯৪।

*

We are glad to hear Mrs. Kadambini Ganguly has been provided with an appointment on the Eden Staff establishment. We can not very well congratulate either Mrs. Ganguly or the medical authorities on this make-shift arrangement and we should have been altogether better pleased if her claim to the Dufferin Hospital appointment had received a practical recognition. As we had occasion of saying lately Mrs. Ganguly is pre-eminently fitted to fill the appointment and if she has not received it, it is not because of her want of ability or experience. Still we dare say better luck will attend her endeavours next time.

—দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট, এপ্রিল ১৮৯৪।

* *

A LADY LECTURER IN THE CAMPBELL MEDICAL SCHOOL—In addition to her duties as outdoor physician to the Eden Female Hospital, Mrs. K. Ganguli D. A. L. R. C P, we are glad to learn, has been appointed to lecture to the lady students of the Campbell Medical School, on the diseases of women. This we believe, is the first instance of a lady being called upon to perform the onerous duties of a Medical lecturer in this country.

—দ্য ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার, ৮. ৪. ১৮৯৪।

* *

পরিণত বয়সে ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কন্যাকে পাশ্চাত্ত্য প্রথায় সুশিক্ষিতা করিয়াছেন। স্বামী দ্বারকানাথ তাঁহার শিক্ষাদানে আরও উৎসাহী ছিলেন। দ্বারকানাথ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন এবং বহুদিন ভারত সভার সহকারী সম্পাদক থাকিয়া সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত তেজস্বী পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিয়া তথায় চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ডাক্তারী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।

তিনি রাজনীতিক কার্য্যেও যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা টিভলী গার্ডেনে মিষ্টার (পরে সার) ফিরোজসা মেটার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তাঁহার পরমাত্মীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দেশের শ্রমজীবীদিগের উন্নতিসাধন অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়াছিলেন।

তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন এবং তাঁহাকে আদর্শ গৃহিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি শোকাতুর হইয়াছিলেন, তাহার পর দৌহিত্র শিল্পী সুকুমার রায়ের মৃত্যু তাঁহার পক্ষে বিষম বেদনার কারণ হয়।

সকালে রোগী দেখিয়া আসিয়া তিনি অসুস্থ হয়েন এবং তাহার পর প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

—মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক ১৩৩০।

* *

## ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা যাঁহারা চান, তাঁহারা স্বর্গীয় ব্রজকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন তাঁহারই কন্যা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। (ঐ বৎসর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসুও বি-এ উপাধি লাভ করেন।) ইহাতে তাঁহার পিতার ও তাঁহার বিদ্যানুরাগ সূচিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মানসিক বলেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এখন বাংলাদেশের হিন্দু সমাজেরও কোনো কোনো বালিকা কলেজে পড়েন, এবং বি-এ উপাধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু চল্লিশ বছর পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা লাভ অপরাধে শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুকে অনেক লোকনিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছিল। বি-এ উপাধি লাভ করিবার পর পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনেক বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। নারীর পক্ষে এইরূপ নূতন কাজের শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতে তাঁহাকে দুর্বৃত্ত লোকদের নিন্দা সহ্য করিতে হয়। তিনি মানসিক বলের দ্বারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করেন এবং ইংলণ্ডে গিয়া চিকিৎসা বিষয়ে আরও যোগ্যতা লাভ করেন। নারীদের উচ্চশিক্ষালাভে এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পথে অগ্রণী বলিয়া তিনি স্ত্রী জাতির ও নারীহিতৈষীদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে কংগ্রেসে ও সমাজ সংস্কার সমিতিতে বক্তৃতা করেন।

কলিকাতায় যে ট্রান্স্‌ভাল্‌ ভারতীয় সভা স্থাপিত হয়, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী তাহার নেত্রী হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। খনিতে মজুরাণীদের কাজ বন্ধ হওয়ায় তিনি ও শ্রীমতী কামিনী রায় বিহার ও ওড়িশা প্রদেশের কোন কোন খনি দেখিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করেন। তিনি সকল দেশের নারীদের রাষ্ট্রীয়-অধিকার-লাভ-প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেন।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০।

# না ট ক

চরিত্র-লিপি

পাত্রী

কাদম্বিনী—বাংলার প্রথম মহিলা চিকিৎসক
মিস অ্যাকরয়েড—শিক্ষাবিদ, নারীহিতৈষী
ব্রহ্মময়ী—দুর্গামোহন দাসের পত্নী
সরলা—ব্রহ্মময়ীর কন্যা
অবলা—ব্রহ্মময়ীর কন্যা
বিধুমুখী—দ্বারকানাথের কন্যা
হরিপ্রিয়া—রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ
বৌমা—প্রভাতের স্ত্রী

পাত্র

দ্বারকানাথ—সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ
দুর্গামোহন—আইনজ্ঞ, সমাজসংস্কারক
শিবনাথ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা, সমাজসংস্কারক
ব্রজকিশোর বসু—ভাগলপুরের হেডমাস্টার, সমাজসংস্কারক, কাদম্বিনীর পিতা
মনোমোহন ঘোষ—প্রখ্যাত ব্যারিস্টার, সমাজসংস্কারক
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রখ্যাত কবি
স্যার আর্থার হবহাউস—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর
স্যার রিভার্স টমসন—বাংলার ছোটলাট
ডাঃ কোটস্—মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল
ডাঃ হার্ভে—মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক
ডাঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র—মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক
২ বাঙালি অধ্যাপক—মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক
১ম, ২য়, ৩য় বৃদ্ধ, দিনুদা, ভোম্বল
প্রভাত—কাদম্বিনীর পুত্র
সতীশ—দ্বারকানাথের পুত্র
ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ
জনতা, রায়বাহাদুর ও নবীনকৃষ্ণ

## প্র থ ম অ ঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

(দুর্গামোহন দাসের বাড়ির বসবার ঘর। দুর্গামোহন, মনোমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী আলোচনারত।)

দুর্গামোহন— দ্বারিবাবু, নবকান্তবাবুরা যে ক'জন কুলীন কন্যাকে উদ্ধার করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, আমার স্ত্রীর আশ্রয়ে তারা সুরক্ষিত আছে ঠিকই, কিন্তু ওদের শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

দ্বারকানাথ— যথার্থ কথা। নবকান্ত বিক্রমপুরে বিরাট এক গণ-আন্দোলনের সূচনা করেছেন। এই আন্দোলনের আলো যেন নিভে না যায়। ওই মেয়ে ক'টিকে সুশিক্ষা দান করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তবে আন্দোলন সফল হবে।

শিবনাথ— তবে আর কি হিরো, তুমি লেগে যাও। ওদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এমন এক বিদ্যালয়, যাতে সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। কেশববাবুর স্কুলের মতো আংশিক শিক্ষা নয়।

দ্বারকানাথ— চাইলেই তো স্কুল করা যায় না। অর্থের জোগান চাই। চাই উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা।

মনোমোহন ঘোষ—আর্থিক দায়ভার আমি গ্রহণ করতে রাজি আছি। অভাগা এই দেশে মেয়েরা চির-লাঞ্ছিত। গাঙ্গুলীভায়া, আপনি এগিয়ে যান।

দুর্গামোহন— নারীহিতৈষী মিস অ্যাকরয়েড এখন কোলকাতায় এসেছেন। আমরা চেষ্টা করলে তাঁকে স্কুলের অধ্যক্ষা করতে পারি। মেয়েদের দেখাশোনার ভার থাকবে আমার স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর ওপর। এছাড়া আমরা সকলেই সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করতে কার্পণ্য করব না।

শিবনাথ— সবার ওপরে থাকবে গাঙ্গুলী ভায়া তুমি নিজে। তুমি অবলাবান্ধব। নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও নারীমুক্তির যে আগুন তুমি জ্বেলেছ তা আগামী দিনের সামাজিক অগ্রগতির মশাল হয়ে উঠুক।

দ্বারকানাথ— আপনারা সবাই যদি সঙ্গে থাকেন, আমি প্রস্তুত। কুলীন কন্যা

হত্যার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে আমি নারীমুক্তি আন্দোলনে প্রবৃত্ত হই। এর পর অবলাবান্ধবের ইতিহাস আপনারা সকলেই জানেন। স্ত্রীশিক্ষা নারীমুক্তির প্রথম সোপান, তাই আদর্শ স্কুল স্থাপনে আমি কখনই পিছিয়ে যাব না।

সমবেত উচ্ছ্বাস— সাধু, সাধু, সাধু।

শিবনাথ— আজ নতুন যুগের সূর্যোদয় হল। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আগামী দিনে সুশিক্ষিত এক দল মেয়ে সামাজিক অগ্রগতির পতাকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পুরুষদের পাশাপাশি তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

দ্বারকানাথ— শুধু তাই নয়। আমাদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি রান্নাবান্না, সেলাই সব কিছুই শেখানো হবে, যাতে মেয়েরা লেখাপড়ার পাশাপাশি সুগৃহিণী হয়ে উঠতে পারে।

(ব্রহ্মময়ী দেবীর প্রবেশ। সকলে উঠে দাঁড়ালেন।)

ব্রহ্মময়ী— আমি পর্দার আড়াল থেকে সব শুনেছি। মেয়ে ক'টি আমার বুকের পাঁজরের মতো প্রিয়। আমার দুই মেয়ে সরলা আর অবলাও এই স্কুলে পড়বে। ওদের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। ওদের গৃহস্থালি শিক্ষা আমিই দেব। এছাড়া আমি প্রতি মাসে স্কুল তহবিলে ১০০৲ টাকা দান করব।

দ্বারকানাথ— মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কোনো কাজই সিদ্ধ হয় না। আপনি হবেন এই বিদ্যালয়ের মাতা। আপনার আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা মাথায় নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব। আমাদের স্কুলের নাম হবে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়।

সমবেত উচ্ছ্বাস— সাধু, সাধু, সাধু।

ব্রহ্মময়ী— আজকে শুভদিনে আমি একটু চা-মিষ্টির আয়োজন করেছি। মিষ্টিমুখ না করে কেউ কিন্তু যাবেন না।

সকলের সহর্ষ উচ্ছ্বাস।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলকাতার রাস্তার ধারে একটি দোতলা বাড়ির সামনের রকে বসে দুই বৃদ্ধ আলাপরত।)

প্রথম বৃদ্ধ— বলি ওহে রমেশ, শুনেছ নাকি বেত্তান্ত?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— কী বেত্তান্ত শোনাবে খুড়ো?

প্রথম বৃদ্ধ— শুনলে তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— ভড়ং রেখে আসল কথাটা বলো না বাবা।

প্রথম বৃদ্ধ— বলি বেম্মরা যে মেয়েদের স্কুল খুলবে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— বলো কী? জাত ধম্ম একদম গোল্লায় যাবে যে! ওরা কি নাটুকে রামনারায়ণের কথা শোনেনি!

প্রথম বৃদ্ধ— সে আবার কী বলল?

দ্বিতীয় যুদ্ধ— শোভাবাজারে রাজবাড়িতে গত দুর্গাপুজোর সময় রামনারায়ণ এসেছিল, বলল কি... (হাসির দমকে কথা বন্ধ)

প্রথম বৃদ্ধ— আঃ মলো যা—কথাটা বলো না—হেসে মরছে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— শুনলে তোমারো একই অবস্থা হবে। যা হোক্ শোনো তবে। রামনারায়ণ বলল, মেয়েদের শুধু 'আ' শিখিয়েই রক্ষে নেই—'চাল আনো', 'ডাল আনো', 'কাপড় আনো', 'গয়না আনো' বলে সবার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। অন্য অক্ষরগুলো শেখালে আর রক্ষে থাকবে না। না জানি কী করে বসবে? হ্যাঃ হ্যাঃ।

প্রথম বৃদ্ধ— হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। বেশ বলেছে। যথার্থ বলেছে। ঘোমটার ভেতর খ্যামটা নাচ শুরু হবে। ঘর, সংসার, সমাজ, ধম্ম সব উচ্ছন্নে যাবে।

(এই সময় তৃতীয় বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন। বগলে খবরের কাগজ, সঙ্গে একটি অল্পবয়সী ছেলে।)

তৃতীয় বৃদ্ধ— কীগো, তোমাদের কীসের মিটিং হচ্ছে?

প্রথম বৃদ্ধ— এই যে দীনুদা, বেম্মদের নেতা দ্বারকানাথ মেয়েদের জন্যে স্কুল খুলছে। জাতধম্মের আর কিছু রইল না।

তৃতীয় বৃদ্ধ— রাখো তো, মেয়েদের আবার পড়াশোনা! শোনো, বেদব্যাসের ভূধর চাটুজ্যে কী লিখেছে।

অন্যান্যরা— কী লিখেছে? কী লিখেছে?

তৃতীয় বৃদ্ধ— আঃ, চুপ করো না বাপু। মন দিয়ে শোনো—"প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেন-না ইহার দ্বারাই নারীর পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়। তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়। বিদ্যা নানারূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু।"

প্রথম বৃদ্ধ— বাঃ বাঃ বাঃ বেশ লিখেছে, যথার্থ লিখেছে।

তৃতীয় বৃদ্ধ— সুতরাং বুঝতে পারছ তো—এইসব স্কুল থেকে দলে দলে মদ্দাটে মেয়ে তৈরি হবে। কলিকাল, বুঝেছ হে, ঘোর কলি। সাধে কি ঈশ্বর গুপ্ত মোশাই লিখেছিলেন।

সকলে— কী, কী লিখেছিলেন?

তৃতীয় বৃদ্ধ— এই মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারেই তিনি লিখেছিলেন।

সঙ্গের ছেলেটিকে—অ্যাই ভোম্বল শোনা না!

ভোম্বল (একগাল হেসে অঙ্গভঙ্গি সহকারে)—

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রতধর্ম কর্তো সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন এবি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।
সব কাঁটা চামচে ধরবে শেষে পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
এরা আপন হাতে বাগিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
বুঝি হুট করে বুট পায়ে পরে চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।
(সকলের সমস্বরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ।)

প্রথম বৃদ্ধ— বেথুনের ল্যাজ ধরে বেম্মরা নৃত্য কর্তে লেগেছে। সমাজ সংসার সব রসাতলে যাবে।

ভোম্বল— তাই তো ওদের ইস্কুলের মেয়েদের দেখলেই দলে দলে ছেলেরা খ্যাপায়—ওঁ তৎসৎ, বেম্মজ্ঞানীর নাকে খত্।

তৃতীয় বৃদ্ধ— চিন্তার কিছু নেই, ওদের ইস্কুল ডকে উঠল বলে!

(সকলের সমস্বরে সমর্থন।)

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## তৃতীয় দৃশ্য

(হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের অফিসঘর। দ্বারকানাথ বসে কাজ করছেন। মিস অ্যাকরয়েডের প্রবেশ। দ্বারকানাথ উঠে দাঁড়ালেন।)

দ্বারকানাথ— সুপ্রভাত, মিস অ্যাকরয়েড।

মিস অ্যাকরয়েড—সুপ্রভাত দ্বারকানাথবাবু।

দ্বারকানাথ— আপনি কাজ ঠিকমতো বুঝে নিয়েছেন তো? কোথাও কোনোরকম অসুবিধে হলে আমাকে জানাবেন।

মিস অ্যাকরয়েড—অবশ্যই দ্বারকানাথবাবু। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের এই আন্দোলনে আমাকে আপনাদের সহযোগী জানবেন।

দ্বারকানাথ— অজস্র ধন্যবাদ। আপনার ওপর ভরসা করেই আমরা স্কুল খোলার ব্যাপারে এগিয়েছি।

মিস অ্যাকরয়েড—আমি ভিতরে যাই। আমাকে ক্লাস নিতে হবে। (প্রস্থান)

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবেশ।

দ্বারকানাথ— আসুন, আসুন শিবনাথবাবু।

শিবনাথ— তোমার স্কুল কেমন চলছে দেখতে এলাম।

দ্বারকানাথ— পাঁচটি মাত্র ছাত্রী নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। কিন্তু আমি পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চাই। কেশববাবুর মতো পুরুষ ও নারীতে শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো ভেদ এই স্কুলে থাকবে না। কিন্তু সমস্যা হল উপযুক্ত বইয়ের অভাব। আমি শিক্ষা প্রবেশ, শিশুর সদাচার ও সুলভ পাটিগণিত লিখতে শুরু করেছি। আশা করি শীঘ্রই ছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে পারব।

শিবনাথ— সাধু, সাধু। ধন্য তুমি হিরো। কী অমানুষিক পরিশ্রম করছ। অর্থসংগ্রহ, স্কুলের ক্লাসের ব্যবস্থা, ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীদের সবরকম দেখাশোনা, আহারাদির ব্যবস্থা, অসুখ বিসুখের সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা—সবকিছু একা দায়িত্ব নিয়ে করে চলেছ। আমি শুধু ভাবছি

মেয়েদের ব্যাপারে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কবি হেমচন্দ্র তাই লিখেছিলেন— "হায় হায় ওই যায় বাঙালির মেয়ে।"

দ্বারকানাথ— হতাশ হলে চলবে না। আমাদের এই স্কুলের ছাত্রীদের মধ্য থেকেই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। হেমচন্দ্রকে এই কবিতার বদলে অন্য কবিতা লিখতে হবে।

শিবনাথ— আমি নিশ্চিত, তোমার স্বপ্ন সফল হবে। দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন, মনোমোহন ঘোষের মিলিত প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হবে না।

দ্বারকানাথ— এর সঙ্গে মা ব্রহ্মময়ী এবং কুমারী অ্যাকরয়েডের কথা ভুললে চলবে না। আপনারাও সঙ্গে আছেন। আছে সমগ্র সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। শিক্ষার মাধ্যমে আসবে মুক্তি। নারীমুক্তির আদর্শ সামনে রেখেই আমাদের যাত্রা শুরু হল।

শিবনাথ— সাধু, সাধু, সাধু।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## পঞ্চম দৃশ্য

(ব্রহ্মময়ীর ঘর। সরলা, অবলা বই নিয়ে বসে পড়ছে। কাদম্বিনীর প্রবেশ। মেয়েরা হই হই করে উঠল।)

সরলা— এই যে কাদু এসে গেছে। আর চিন্তা নেই। কাদু আমার অঙ্কগুলো একটু দেখে দে না ভাই।

অবলা— আমার Translation-এর খাতাটা বার করি?

কাদম্বিনী— আরে আমি কি তোদের চেয়ে বেশি জানি? সরলা, তুই তো ক্লাস টেস্টে অঙ্কে ফার্স্ট হয়েছিস। তোর অঙ্কে এত ভয় কেন? আর অবলা, তোর ইংরেজি লেখার তো মিস অ্যাকরয়েড যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ক্লাস টেস্টেও তো তোর ভালো নম্বর আছে। তবে?

সরলা— সে যাই বলো, অঙ্কের কথা ভাবলেই আমার পেটের মধ্যে গুড় গুড় করে। এই বুঝি ভুল হল! ছোট্ট একটু ভুলে পুরো রেজাল্ট বদলে যায়।

অবলা— আমারও ভাই একই অবস্থা। ইংরেজি ট্রানস্লেশনের কথা ভাবতেই আমার গা, হাত, পা হিম হয়ে আসে।

কাদম্বিনী— তোদের মতই আমারও কখনও কখনও ভয় ভয় করে। কিন্তু আমি জোর করে তা মন থেকে সরিয়ে দিই।

সরলা— ঈশ্বর যে কেন মেয়েদের মনে এত ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন?

কাদম্বিনী— ঈশ্বরকে দোষ দিয়ে লাভ কী? ঈশ্বর সব মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন। কুসংস্কারের জন্য এদেশের পুরুষরা মেয়েদের সব ব্যাপারে পেছনে টেনে রেখেছে। দ্বারকাদা এ ব্যাপারে ভারী সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেন। সেদিন বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা এক কবিতা শোনাচ্ছিলেন—

না জাগিলে আজি ভারত ললনা
এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না।

অবলা— সত্যি, দ্বারকাদা এক আশ্চর্য মানুষ। উনি সামনে এসে দাঁড়ালেই আমাদের মনের ভেতর যেন আলো জ্বলে ওঠে।

সরলা— ঠিক তাই। আমরা তো স্থির করেছি ওঁর আদর্শেই আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

অবলা— ভেবে দেখ, একজন মাত্র মানুষ কী অপরিসীম শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন। একটা স্কুল মাথায় করে রেখেছেন। সব কিছু একেবারে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ একহাতে করে চলেছেন।

কাদম্বিনী— শুধু কি তাই? ক্লাসে কী সুন্দরভাবে সব কিছু বুঝিয়ে দেন। সাহস দেন। ওঁর কথা শুনলে যেন বেঁচে থাকার একটা আলাদা মানে খুঁজে পাই। বিপদে কীভাবে পাশে এসে দাঁড়ান। একদিন স্কুলে আসছি। গেটের মুখে এসে গেছি। একদল ছেলে 'ওঁ তৎসৎ বেম্মজ্ঞানীর নাকে খৎ' বলতে বলতে ঢিল ছুঁড়ছিল। আমি ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছি। এমন সময় দ্বারকাদা একটা লাঠি হাতে বেরিয়ে আমার পাশে দাঁড়ালেন। মাটিতে লাঠিটা ঠুকে বললেন —"তোরা কি ভদ্রঘরের ছেলে নোস। ছোটো মেয়েটাকে উত্ত্যক্ত করছিস কেন? কিছু বলার থাকলে আমাকে এসে বল। এই মেয়েই একদিন তোদের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার আলোয় চারদিক আলোকিত করে তুলবে।"

বিশ্বাস করবি না, অতগুলো ছেলে কুকুরের মতো পালিয়ে গেল। আমার দিকে ফিরে দ্বারকাদা বললেন—"কখনও অসত্য ও অন্যায়ের সামনে মাথা নত করবে না। সত্যের পথে চলতে কখনও ভয় পাবে না। সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।"

বিশ্বাস কর ভাই, এই কথায় আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। স্যারের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পথ চলার শপথ সেই মুহূর্তেই আমি নিয়েছি। ভালো কথা, তোরা কি কোনোদিন স্যারের বাড়ি গেছিস?

সরলা— একবার বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। স্যারের মেয়ে বিধুমুখী আমার সই হয়েছে। সতীশ ছেলেটা ভারি মিষ্টি।

কাদম্বিনী— স্যারের জীবন বড়ো দুঃখের। বৌদি অসময়ে মারা গেছেন। ওইটুকু মেয়ে বিধুমুখী সংসার সামলাচ্ছে। তার ওপর অসুস্থ সতীশ। এত কাজের মধ্যে থেকেও স্যার সংসারের ব্যাপারে বড়োই অসহায়। আর সতীশ শুধু বড়ো বড়ো চোখে অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে। বড়ো মায়াময় চোখ। আহা যদি সারাজীবন ওকে কাছে রেখে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুলতে পারতাম!

(ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ।)

ব্রহ্মময়ী— কী রে তোদের গল্প হল! সন্ধে হয়ে এল, জলখাবার খেতে হবে না? হ্যাঁরে কাদুমা, তোর বাবা, মা ভালো আছেন তো?

কাদম্বিনী— (ব্রহ্মময়ীকে প্রণাম করে) হ্যাঁ মাসিমা, বাড়ির সবাই ভালো আছে। তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

ব্রহ্মময়ী— আমার আবার শরীর! শরীর নিজের ধর্ম পালন করছে। আর আমি পালন করছি আমার ধর্ম। চল মা, সবাই মুখ হাত ধুয়ে দুটি মুখে দিবি চল।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

**প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত**

## দ্বি তী য় অ ঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

(দ্বারকানাথের বাড়ি। বসবার ঘরে বসে দ্বারকানাথ লিখছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবেশ।)

শিবনাথ— হিরো তুমি তাহলে করেই ছাড়লে! মিস অ্যাকরয়েডের সঙ্গে বরিশালের জজসাহেব হেনরি বেভারিজের বিয়ের পর হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় যখন উঠে গেল তখন আমরা ভেবেছিলাম যে, আমাদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসার আন্দোলনে দাঁড়ি পড়ল। কিন্তু দেখালে বটে তুমি, এক মাসের মধ্যে ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে বাড়ি ভাড়া করে শুরু করলে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। পুরোনো স্কুলের সব ছাত্রীই এই স্কুলে ফিরে এল। শাবাশ ভাই। শাবাশ তোমার কর্মকৃতিত্ব।

দ্বারকানাথ— আমি একা নই। দুর্গামোহন দাস আর আনন্দমোহন বসু পাশে দাঁড়িয়েছেন। অর্থসাহায্য করেছেন বিচারপতি ফিবার, মনোমোহন ঘোষ আর মহারানী স্বর্ণময়ী। এছাড়া মাথার ওপর মা ব্রহ্মময়ী তো আছেনই।

শিবনাথ— না না, তোমার নিজের কথা বাদ দিলে চলবে না। শিক্ষকতার সঙ্গে স্কুলের কাজে সমস্ত দেহমন নিয়োগ করে তুমি এই অসাধ্যসাধন করেছ। ভালো কথা, তোমার স্কুলের রেজাল্ট তো যথেষ্ট ভালোই হচ্ছে।

দ্বারকানাথ— ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৪৩ জনের মধ্যে মোট ১৩ জন পাস করেছে। এর মধ্যে পাঁচজন আমাদের ছাত্রী। কাদম্বিনী বসু, সরলা দাস, সুবর্ণপ্রভা বসু, অবলা দাস আর সরলা মহলানবীশ।

শিবনাথ— শাবাশ। একেবারে ভেলকি দেখিয়ে দিলে! আমি দেখতে পাচ্ছি, তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের ওপর দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার তরী তর তর করে এগিয়ে চলছে। নাবিক দ্বারকানাথ।

দ্বারকানাথ— শুধু মৌখিক প্রশংসায় চলবে না। আপনার কাছে আমার দাবি, আপনার কন্যাকে আমাদের স্কুলের ছাত্রী হিসাবে পেতে চাই।

শিবনাথ— তোমার অনুরোধে অসম্মত হব এও কি সম্ভব? হেমলতা অবশ্যই এই স্কুলে যোগ দেবে।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

(বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। অফিসঘরে দ্বারকানাথ কর্মরত।)

কাদম্বিনী— স্যার আসতে পারি?

দ্বারকানাথ— এসো কাদম্বিনী। কোথাও কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? বলো, কী চাও?

কাদম্বিনী— না স্যার। আপনার এবং অন্য শিক্ষিকার কাছ থেকে পড়াশোনার ব্যাপারে সব রকম সাহায্য ও অনুপ্রেরণা পেয়ে আমরা সবাই ধন্য হয়েছি। কিন্তু আমার অন্য একটি প্রশ্ন আছে।

দ্বারকানাথ— নির্ভয়ে বলো।

কাদম্বিনী— শুনছি আমাদের বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে? বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে আমরা থাকতে পারব না।

দ্বারকানাথ— ঠিকই শুনেছ। তোমাদেরই স্বার্থে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিশে যাবে। তোমরা সরাসরি বেথুন স্কুলের ছাত্রী হয়ে যাবে।

কাদম্বিনী— আমি প্রথম থেকেই আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত। 'বিদ্যা আনে মুক্তি' এই মন্ত্র আপনার কাছ থেকেই জেনেছি। আমাকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে দেবেন না।

দ্বারকানাথ— আমাকে ভুল বুঝো না। আমাদের বিদ্যালয় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এর স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক দানে কোনমতে চালাতে হয়। লেডি লিটন থেকে লেফটেনান্ট গভর্নর গ্রান্ট সবাই এই স্কুলের মান দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। গ্রান্ট তো তোমার আর সরলার ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং অ্যালজেবরার জ্ঞান দেখে মুগ্ধ। তিনি বলেছেন—তোমরা এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার উপযুক্ত। বেথুন স্কুল সরকারি স্কুল। সেখানে তোমরা যোগ্য শিক্ষিকা আর পরিকাঠামো পাবে। তাই আমি মনোমোহন ঘোষকে দিয়ে বেথুন স্কুলের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থের কাছে আমাদের দুই প্রতিষ্ঠান মিলিত করার প্রস্তাব পাঠাই। স্যার রিচার্ড গার্থ আমাদের স্কুল পরিদর্শন করে মুগ্ধ হন। এরপর

বেথুন স্কুল কমিটি আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে আমাদের কাছে এই দুই স্কুল মিলিত করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সামনে একটা বিরাট সুযোগ এসেছে কাদম্বিনী। তোমাদের এখন অন্য সব বিষয় ভুলে একনিষ্ঠভাবে পড়াশোনা করে যেতে হবে। মনে রেখো, তোমরা কিন্তু সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছ। মনে কোনো দ্বিধা না রেখে এগিয়ে যাও কাদম্বিনী। বাংলার চিরবঞ্চিত নারীসমাজ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

কাদম্বিনী— আমি বেথুন স্কুলে গেলেও আপনাকে কিন্তু আমার পাশে থাকতে হবে। পথ দেখাতে হবে। না হলে আমি ভেসে যাব।

দ্বারকানাথ— আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, আমার আশীর্বাদ সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকবে। তোমাদের সমস্ত ব্যাপারে আমি নজর রাখব। মাঝে মাঝে তোমার বাড়ি গিয়ে আমি তোমার খোঁজ নেব, প্রয়োজনীয় উপদেশ দেব। প্রয়োজনমতো তুমিও আমার বাড়িতে এসে যে-কোনো বিষয় আমার কাছে জেনে নেবে।

কাদম্বিনী— আমি কিন্তু আপনাকেই অনুসরণ করব। আপনি আমার পাশে থাকুন, পথ দেখান।

দ্বারকানাথ— তোমার সঙ্গে আমি আছি। নির্ভয়ে এগিয়ে চলো।

(কাদম্বিনী হাঁটু মুড়ে বসে দ্বারকানাথকে প্রণাম করলেন। দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর মাথায় রাখলেন আশীর্বাদের হাত।)

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## তৃতীয় দৃশ্য

(দ্বারকানাথের বাড়ি। মঞ্চে একটি পার্টিশন দেওয়া। একদিকে বসবার ঘরে দ্বারকানাথ বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। অন্যদিকে শোবার ঘরে একটি তক্তাপোষে বিছানা পাতা। একটি ছোট ছেলে পুতুল নিয়ে খেলা করছে।

বসবার ঘরে কাদম্বিনীর প্রবেশ। হাতে বই ও খাতা।)

দ্বারকানাথ— এসো, টাস্ক করেছ?

কাদম্বিনী— হ্যাঁ স্যার।

দ্বারকানাথ— বসো, দেখি কী করেছ?

(দ্বারকানাথ খাতা পরীক্ষা করছেন।)

দ্বারকানাথ— বাঃ, অঙ্কগুলো তো সবই ঠিক করেছ। ট্রানস্লেসনের খাতাটা দেখি।

(কাদম্বিনী খাতাটা এগিয়ে দিলেন।)

দ্বারকানাথ— (খাতা দেখতে দেখতে)—মোটামুটি ঠিকই আছে। কিছু correction করলাম দেখে নিও। আরো খাটতে হবে কাদম্বিনী। ভালো রেজাল্ট করতে হলে একাগ্র হয়ে পরিশ্রম করে যেতে হবে।

(পাশের ঘরে বিধুমুখী খাবার এনে সতীশকে খাওয়াবার চেষ্টা করছে।)

সতীশ— আমি কিছুতেই খাব না। তুমি আমায় গল্প বলো না। মা আমায় কেমন গল্প বলত।

বিধুমুখী— আমার সোনাভাই, আমি তোমায় শোবার সময় গল্প বলব। এখন আমার অনেক কাজ আছে। খেয়ে নাও।

সতীশ— কক্ষণও না, কিছুতেই না। আমি খাব না, খাব না, খাব না (কান্না)

(বসবার ঘর)

কাদম্বিনী— স্যার আমি একটু ভেতরে যাই। সতীশ বড্ড কাঁদছে।

দ্বারকানাথ— এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তুমি একদিন এসে কী করবে! তার চেয়ে এই Paragraph টা translate করো দেখি!

কাদম্বিনী— আপনার দেওয়া সব টাস্ক আমি করব। কিন্তু এখন একটু ভেতরে যাচ্ছি স্যার, প্লিজ্।

(পাশের ঘরে কাদম্বিনী এসে সতীশকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। দ্বারকানাথও এসে দাঁড়ান।)

কাদম্বিনী— আমার সতীশবাবুর রাগ হয়েছে?

সতীশ— তুমি কেন এতদিন আসোনি?

কাদম্বিনী— এই তো আজ আমি তোমার কাছে এসেছি। এবার খেয়ে নাও। আমি তোমাকে অনেক অনেক গল্প বলব।

সতীশ— তুমি একদম আমার মা। তুমি খাইয়ে দাও, তাহলে আমি খাব।

দ্বারকানাথ— সতীশ, ওকে মা বলে ডাকবে না। ও আমার ছাত্রী। তোমার দিদি।

সতীশ— মোটেই না। দিদি তো ওটা (বিধুমুখীকে দেখিয়ে), এ আমার মা।

দ্বারকানাথ— বারণ করছি তোমায়। কাদম্বিনীকে মা বলে ডাকবে না।

সতীশ— বেশ করব ডাকব। মা, মা, মা।

দ্বারকানাথ— বেয়াদব ছেলে, মার না খেলে তুমি ঠিক হবে না। (মারতে উদ্যত)

কাদম্বিনী— (সতীশকে জড়িয়ে ধরে)—কী করছেন স্যার? ও অবোধ শিশু।

দ্বারকানাথ— তুমি জানো না কাদম্বিনী ওর জন্য আমার কত চিন্তা, কত যন্ত্রণা। আমি আমার এত কাজের মধ্যেও ওর জন্য সময় বার করে ওকে সঙ্গ দিই। ওর চিকিৎসার জন্য সব রকম ব্যবস্থা আমি নিয়েছি। ওর মন ভালো রাখার জন্য আমি আর বিধুমুখী সব সময় চেষ্টা করি। কিন্তু ওর মন পাই না। এতটুকু সহযোগিতা করে না।

কাদম্বিনী— ও অবোধ শিশু, তাই ও অমন করে। মারধোর করে কি এর সমাধান হয়? আমি এলেই ও শান্ত হয়ে যায়। এই তো কেমন খাচ্ছে। (সতীশকে খাওয়ান কাদম্বিনী।)

সতীশ (ফিস ফিস করে) তুমি খাবার পর গল্প বলবে তো?

কাদম্বিনী— (সতীশকে আদর করে)—নিশ্চয়, আমি সতীশবাবুকে অনেক গল্প বলব।

(দ্বারকানাথ বসবার ঘরে ফিরে এসে অধৈর্যভাবে পায়চারি করেন। ক্রমে শোবার ঘরের আলো নিভে যায়। কাদম্বিনী বসবার ঘরে ফিরে আসেন।)

কাদম্বিনী— সতীশকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।

দ্বারকানাথ— ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না। সতীশ এরপর তোমাকে expect করবে। তুমি তো আর রোজ এসে ওকে ঘুম পাড়াতে পারবে না!

কাদম্বিনী— আপনি বললে আমি রোজই এসে ওকে দেখে যেতে পারি।

দ্বারকানাথ— কখনও না কাদম্বিনী, তোমার একমাত্র লক্ষ্য হবে পড়াশোনা। এ শুধু তোমার একার প্রয়োজনে নয়, এ আমার স্বপ্ন। স্ত্রীশিক্ষার অচলায়তনের দ্বার তোমরাই খুলবে। অন্ধকার দেশে তোমরাই হবে আলোর দিশারী। কাদম্বিনী লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ো না।

কাদম্বিনী— আমি আমার সমস্ত জীবন দিয়ে আপনার স্বপ্ন পূর্ণ করব। কিন্তু সতীশের কাছে আমাকে আসতে বারণ করবেন না। ওর ওই অসহায় দুটি চোখ আমায় পাগল করে দেয়। আমি সব সময় ওর জন্য দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকি। ইচ্ছে করে সারা জীবন ওকে আমার বুকের মধ্যে আগলে রাখি।

দ্বারকানাথ— এ মায়ার টান তোমাকে কাটাতে হবে। তুমি তো আর সত্যসত্যই সারাজীবন সতীশকে নিয়ে কাটাতে পারবে না। গ্রাজুয়েশনের পরেই নিশ্চয় তোমার বাবা ভালো ঘরে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে।

কাদম্বিনী— (নিষ্পলক দৃষ্টিতে দ্বারকানাথের দিকে তাকিয়ে)—ভবিষ্যতে কী হবে কে বলতে পারে? কিন্তু বর্তমানের হৃদয়ের ডাক আমি অবহেলা করতে পারব না। মাঝে মাঝে সতীশের কাছে আমি আসবই। কিন্তু আমার অন্য কর্তব্যেও আমি অবহেলা করব না। আপনার স্বপ্ন আমি পূর্ণ করবই।

(দু'জনে দু'জনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।)

।। মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে এল।।।

## চতুর্থ দৃশ্য

(কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের চেম্বার। ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আর্থার হবহাউস বসে আছেন। সামনে বসে স্যার রিচার্ড গার্থ, দ্বারকানাথ, মনোমোহন ঘোষ।)

গার্থ— মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন—দয়া করে আমার স্কুলের দুই ছাত্রী কাদম্বিনী ও সরলাকে এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিন।

স্যার আর্থার হবহাউস—আমি তো তাই চাই। কিন্তু সেনেট আর সিন্ডিকেটের ভারতীয় সদস্যরা এর বিরোধী। এই জন্যেই দেরাদুনের চন্দ্রমুখীকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিলেও সফল ছাত্রদের তালিকায় তার নাম তোলা যায়নি।

দ্বারকানাথ— যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের নারী অবহেলিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত। নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন রাজার রাজা রামমোহন রায়। আমরা স্বপ্ন দেখি বাংলা তথা ভারতের মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক নতুন শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবে। কাদম্বিনী ও সরলা এই আন্দোলনের দুই সৈনিক। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, আপনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নারীহিতৈষী। দয়া করে আমাদের এই দুই ছাত্রীর উচ্চশিক্ষার পথের বাধা দূর করুন।

মনোমোহন স্যার, দ্বারকানাথই এই দুই ছাত্রীকে গড়ে তুলেছেন। উচ্চশিক্ষা লাভ করলে এরা সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

স্যার রিচার্ড গার্থ—বেথুন স্কুলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বলতে পারি এরা দু'জনেই এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সুযোগ পেলে এরা দেখিয়ে দেবে যে পরীক্ষার্থী ছেলেদের থেকে এরা কোনো অংশে কম নয়।

স্যার হবহাউস— আমি আপনাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে চলেছে। জীবনের এই স্পন্দন

আমরা উৎসাহিত বা নিবৃত্ত করতে পারি। উৎসাহিত করাই আমি সঙ্গত মনে করি।

দ্বারকানাথ— অনেক ধন্যবাদ স্যার। সমগ্র জাতি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

স্যার আর্থার হবহাউস—কিন্তু বিরোধী পক্ষের কথা মনে রেখে আমি একটি পরীক্ষার আয়োজন করতে চাই। বলতে পারেন এক ধরনের টেস্ট পরীক্ষা। পরীক্ষক হিসাবে থাকবেন পোপ, গ্যারেট, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার। এই পরীক্ষায় পাশ করলে মেয়ে দুটি এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে পারবে। আপনারা সম্মত হলে আমি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ দেব।

গার্থ— আমরা সম্মত স্যার। আমাদের মেয়েরা পরীক্ষা দিয়েই নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে।

দ্বারকানাথ— অজস্র ধন্যবাদ ও অভিনন্দন স্যার। ভারতের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে আপনার নাম অমর হয়ে থাকবে।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## পঞ্চম দৃশ্য

(দ্বারকানাথের বাড়ি। দ্বারকানাথ, শিবনাথ ও মনোমোহন আলোচনারত।)

শিবনাথ— কাদম্বিনী তো সসম্মানে এনট্রান্স পাশ করল। সরলাও যদি পরীক্ষা দিতে পারত আরো ভালো হত।

দ্বারকানাথ— কী করা যাবে? মা ব্রহ্মময়ী অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মাতৃহারা মেয়েকে নিয়ে দুর্গামোহন আতান্তরে পড়লেন। তাই উচ্চশিক্ষিত পাত্র প্রসন্নকুমারকে পেয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তবে আমার বিশ্বাস, সরলা শুধুমাত্র সুগৃহিণী হয়ে দিন কাটাবে না। শুনেছি বাড়িতেই সে মেয়েদের স্কুল খুলবে।

শিবনাথ— কাদম্বিনীর এই সাফল্যে সারা দেশে আলোড়ন এসেছে।

দ্বারকানাথ— তা তো বটেই! ছোটলাট বাহাদুর বই উপহার দিয়েছেন। ভাওয়ালের রাজকুমার দিয়েছেন বই আর সোনার মেডেল। বেথুন স্কুলে অনুষ্ঠান করে গার্থ সাহেব এই সব উপহার কাদম্বিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি কন্‌ভোকেশনে ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর বক্তৃতায় এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষার কাগজেই এই ঐতিহাসিক সাফল্যের সংবাদ ছাপা হয়েছে।

শিবনাথ— কিন্তু শুধু উচ্ছ্বাসে কাজ হবে না। কাদম্বিনীকে উচ্চশিক্ষায় পরবর্তী ধাপ পেরোতে হবে।

দ্বারকানাথ— ভাবাভাবির কিছু নেই। এতদূর যখন এগোনো গেছে তখন কাদম্বিনীকে বি. এ. পাশ করতে হবে। কিন্তু এর জন্য বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খুলতে হবে। আনতে হবে উপযুক্ত অধ্যাপক। এ ব্যাপারে বেথুন স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছি। সংবাদপত্রেও লিখেছি।

মনোমোহন— একটা সুখবর জানাই। তোমার আবেদনের ভিত্তিতে বেথুন স্কুলে কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত কর্মসমিতি গ্রহণ করেছে। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে অধ্যাপক শশিভূষণ দত্তকে।

সকলে— সাধু, সাধু, সাধু।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## ষষ্ঠ দৃশ্য

(ব্রজকিশোরবাবুর বাড়ি। কয়েকজন আত্মীয়স্বজন বসে আছেন। উৎসবের পরিবেশ। ব্রজকিশোর-পত্নী সবাইকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন।)

ব্রজকিশোর— আজ আমার বড়ো আনন্দের দিন। আমার কাদম্বিনী মা বি. এ. পাশ করেছে। আপনারা সবাই আশীর্বাদ করুন যাতে ও জীবনে সফল হয়।

এক বৃদ্ধ আত্মীয়—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনার মেয়ে সফল হবে না? আপনি সারাজীবন স্ত্রীশিক্ষার জন্য লড়াই করছেন।

(সকলের সহর্ষ সমর্থন।)

(কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ।)

হেমচন্দ্র— আসতে পারি ব্রজকিশোর বাবু, আমি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রজকিশোর— কবি হেমচন্দ্র, কী সৌভাগ্য! আসুন, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

হেমচন্দ্র— আমি আপনার কন্যা কাদম্বিনীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ব্রজকিশোর— আমি এখনই তাকে ডাকছি। মা কাদম্বিনী, একটু বাইরে এসো।

(কাদম্বিনীর প্রবেশ)

কাদম্বিনী— আমাকে ডাকছেন বাবা?

ব্রজকিশোর— কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

(কাদম্বিনী এগিয়ে গিয়ে হেমচন্দ্রকে হাত তুলে নমস্কার করলেন।)

হেমচন্দ্র— মাগো, আমি তোমার কাছে এবং বাংলার সমগ্র নারীসমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমি তোমাদের চিনতে পারিনি মা। আমার আগের লেখা 'বাঙালীর মেয়ে' ভুল ধারণা থেকে লেখা। আমি মত বদলেছি। তোমাকে আর চন্দ্রমুখী মাকে দেখে আমি নতুন কবিতা লিখেছি—

"হরিণ নয়না শুনো কাদম্বিনী বালা
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা।
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন
অই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি 'বাঙালীর মেয়ে'

তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে।
বেঁচে থাক, সুখে থাক চিরসুখে আর
কে বলে রে বাঙালীর জীবন অসার?
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে
ভাসিল আনন্দভেলা কালের জুয়ারে।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।"

(সকলে সহর্ষে—সাধু, সাধু, সাধু।)
(কাদম্বিনী হেমচন্দ্রকে হাঁটু মুড়ে বসে প্রণাম করলেন।)

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

**দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত**

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

(দ্বারকানাথের বাড়ি। দ্বারকানাথ বসবার ঘরে বসে বই পড়ছেন। কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কাদম্বিনী— স্যার, আসতে পারি?

দ্বারকানাথ— এসো এসো, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী বসু। দ্বারকানাথের অভিনন্দন গ্রহণ করো।

কাদম্বিনী— ওইভাবে বলবেন না। স্নাতক কাদম্বিনী আপনারই সৃষ্টি। আপনি পাশে না থাকলে, আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত না হলে কখনই আমি এই অবধি এগোতে পারতাম না।

দ্বারকানাথ— কাদম্বিনী, তুমি প্রতিভাবান ছাত্রী। শিক্ষক সকলকেই অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু প্রতিভাধরই সাফল্যের মুখ দেখে। অবশ্য এর সঙ্গে চাই নিষ্ঠা, অধ্যবসায় আর একাগ্রতা, যা তোমার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আছে।

কাদম্বিনী— এর পর আমার কী করা উচিত, আদেশ করুন।

দ্বারকানাথ— খুব সহজেই এম. এ. পাশ করে তুমি শিক্ষিকা হতে পারো। চন্দ্রমুখী সম্ভবত ওই পথেই যাবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা, তুমি চিকিৎসক হয়ে দুঃস্থ অসুস্থ মানুষের সেবা করো। বিশেষ করে মেয়েদের। কুসংস্কারের জন্য প্রসব ও অন্যান্য মেয়েলি রোগের চিকিৎসা এখনও অশিক্ষিত দাইদের ওপর নির্ভরশীল। যে জন্য অসংখ্য মেয়ে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে এবং বিভিন্ন রোগে একরকম বিনা চিকিৎসায় বা ভুল চিকিৎসায় মারা যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে একমাত্র মহিলা চিকিৎসক। তুমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করো।

কাদম্বিনী— আমার হাতের এই বইটি আপনার লেখা বীরনারী নাটক। এর একটি অংশ আমি আপনাকে শোনাতে চাই।

দ্বারকানাথ— বেশ, পড়ে শোনাও।

কাদম্বিনী— "দেবকী—আমি ধন্বন্তরী হব কেমন করে?
সুরঙ্গমা—কেন, চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ে।

দেবকী—(দীর্ঘশ্বাস সহকারে) পোড়া মেয়েমানুষের জাতকে পড়াবে কে?

সুরঙ্গমা—কেন, তুমি কখন পড়তে চেয়েছ যে, কেউ তোমায় পড়ায় নি?

দেবকী—মেয়ে মানুষের সেই পথে কণ্টক।"

দ্বারকানাথ— সাধারণভাবে সমাজের স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী অবস্থা বোঝাতে আমি এই নাটক লিখেছি। কিন্তু কাউকে শিক্ষার পথ থেকে নিবৃত্ত করা কখনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কেন, তুমি কি কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের লেখা পড়নি—

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?"

বাধা আসবেই কাদম্বিনী। পথ চলতে কাঁটার দংশন আসবেই। হৃদয় রক্তাক্ত হবে, কিন্তু লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। মনে রেখো, তুমি কিন্তু সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছ। আর আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি।

কাদম্বিনী— আমি আপনার নির্দেশ মেনে চলব। কিন্তু আমার আরো কিছু কথা বলার আছে।

দ্বারকানাথ— নিশ্চয়। তুমি মন খুলে তোমার সব দ্বিধা, সংশয়ের কথা বলো।

কাদম্বিনী— কোনো দ্বিধা নয়। নয় কোনো সংশয়। আমি চাই, আপনি আমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করুন।

দ্বারকানাথ— এ তুমি কী বলছ! আমি তোমার থেকে ১৭ বছরের বড়ো। তাছাড়া আমি বিপত্নীক, আমার দুটি সন্তান আছে, তুমি তো তাদের দেখেছ। তুমি অসাধারণ সুন্দরী, বাংলার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। আমি শুনেছি, কয়েকটি রাজবাড়ি থেকে তোমার সম্বন্ধ এসেছে।

কাদম্বিনী রাজবাড়িতে অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য থাকে, হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমি আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হব না। এর পাশাপাশি আমি গৃহিণী হিসাবে আপনার সংসারের দায়িত্ব নিতে চাই। সতীশকে আমি সযত্নে সুস্থ করে তুলতে চাই। স্বামী হিসাবে আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করতে পারব না।

দ্বারকানাথ— কাদম্বিনী, তুমি বুঝছ না, তোমার বাবা, মা, আমার ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুরা কেউ এই বিয়ে সমর্থন করবেন না। কুৎসার ঝড় উঠবে।

কাদম্বিনী— কোনো বাধা, কোনো কুৎসা আমাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। আমার কুমারী হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমায় গ্রহণ করুন, নাহলে আমি ভেসে যাব।

দ্বারকানাথ— (দৃশ্যত উদ্‌ভ্রান্ত)—তুমি যখন কোনো কথাই শুনবে না তখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে।—এ হবে এক দায়বদ্ধ দাম্পত্য সম্পর্ক। আমাদের দু'জনকে কিন্তু পরস্পরের আদর্শে অবিচল থাকতে হবে।

(কাদম্বিনী এগিয়ে এসে দ্বারকানাথের হাঁটু মুড়ে বসে প্রণাম করলেন। দ্বারকানাথ দু'হাত ধরে তাকে তুললেন। এবার তাঁরা দু'জনে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন।)

।। মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে এল।।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলকাতার রাস্তার ধার। একটি রকের ওপর দুই বৃদ্ধের আড্ডা।)

প্রথম জন— ওহে রমেশ, তোমার বগলে ও কি কাগজ?

দ্বিতীয় জন— বেম্মদের কাগজ পরিচারিকা।

প্রথম জন— বেম্মদের কাগজ বগলে নিয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার কি ভীমরতি ধরল?

দ্বিতীয় জন— আরে না খুড়ো। এতে একটা মজার খবর আছে।

প্রথম জন— বলি কী খবর? পড়ো তো শুনি।

দ্বিতীয় জন— (শোনো তবে। "বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীমতী কাদম্বরী বসুর সহিত শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। শুনিলাম এই বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু র‍্যাংলার, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ, শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় বাবু প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিবাহ সভায় উপস্থিত হন নাই। শুনা যায় দ্বারিবাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি অথচ তাঁহার বিবাহে সাধারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীর সভ্য ও প্রচারকগণ উপস্থিত রহিলেন না। কেন যে উপস্থিত রহিলেন না তাহা আমরা বুঝিতে কষ্ট পাই।"

প্রথম জন— কিন্তু আমরা বুঝিতে কোনো কষ্ট পাই না। আসলে দ্বারকানাথের মুখোশ খুলে গেছে। স্ত্রীশিক্ষা, স্কুল করা সব কিছুর মধ্যে আসল উদ্দেশ্য এটাই ছিল। মেয়ের বয়সী ছাত্রীকে বে করাতে থলির মধ্যে থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে গেছে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, বেম্মদের মুখে আগুন।

দ্বিতীয় জন— শুনেছি মেয়েটা নাকি সুন্দরী। বেম্মদের অনেকের ওর ওপর নজর ছিল। তাই ওদের বিয়েতে কেউ যায়নি। ওদের সমাজে ভাঙন ধরল বলে! তাই যেন হয়, তাই যেন হয়! হে ঈশ্বর, বেম্মদের সর্বনাশ হোক। ওরা উচ্ছন্নে যাক।

দ্বিতীয় জন— কিন্তু শোনা যাচ্ছে, দ্বারকানাথ তার বৌকে ডাক্তারি পড়াবে বলে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করবে।

প্রথম জন— রাখো তো! বউকে আবার পড়াবে? পড়াশোনার এখানেই ইতি। বাড়ির বৌ পড়বে তো আঁতুড় ঘরে ঢুকবে কে? হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

দ্বিতীয় জন— যা বলেছ। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

(দু'জনে কদর্য অঙ্গভঙ্গি করে হাস্যরত।)

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## তৃতীয় দৃশ্য

(বাংলার ছোটলাটের চেম্বার। মাননীয় ছোটলাট উপবিষ্ট। উপস্থিত দ্বারকানাথ ও মনোমোহন ঘোষ।)

মনোমোহন ঘোষ—মাননীয় স্যার টমসন, আপনার কাছে আমাদের বিনীত আবেদন—দয়া করে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করার নির্দেশ দিন।

এই প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই, ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কাদম্বিনীর আবেদন অনুমোদন করলেও মেডিক্যাল কাউন্সিল এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে। অথচ সরকারি আইন অনুযায়ী বি. এ. পাশ করার পর যে-কোনো ব্যক্তির বিনা বেতনে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার অধিকার আছে।

দ্বারকানাথ— মাননীয় স্যার, বাংলার রাজা রামমোহন রায়ের আমল থেকেই নারীমুক্তি আন্দোলন চলছে। স্ত্রীশিক্ষা নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম সোপান। বেথুন তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় দান করে বেথুন স্কুল গড়ে তোলেন। এই স্কুল ও কলেজেরই ছাত্রী কাদম্বিনী। আপনার সহযোগিতা পেলে সে আগামী দিনে প্রথম মহিলা চিকিৎসক হিসাবে দেশের অসুস্থ মানুষের, বিশেষত মহিলাদের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করবে। এই প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের সম্ভাবনা কেবলমাত্র মেডিক্যাল কাউন্সিলের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে নষ্ট হতে দেবেন না। দয়া করে হস্তক্ষেপ করুন। সুবিচার করুন কাদম্বিনীর ওপর।

স্যার রিভার্স টমসন—আমি আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত। ডি. পি. আই. শ্রীমতী গাঙ্গুলীর আবেদন অনুমোদন করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নাকচ করে কাদম্বিনীকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির নির্দেশ দিচ্ছি। শ্রীমতী গাঙ্গুলী সুবিচার পাবেন।

মনোমোহন— ধন্যবাদ স্যার।

দ্বারকানাথ— অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমাদের সমগ্র জাতি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## চতুর্থ দৃশ্য

(মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের চেম্বার। প্রিন্সিপাল ডাঃ কোটস্ এবং কলেজ কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যরা উপস্থিত। কাউন্সিলের সভা চলছে।)

প্রিন্সিপাল ডাঃ কোটস্—আলোচনার পরবর্তী বিষয়, মেডিক্যাল কলেজে প্রথম ছাত্রী হতে চলেছেন শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। আপনারা এ বিষয়ে মতামত জানান।

ডাঃ হার্ভে— এ অতি শুভ সংবাদ। বাঙালিরা বড়োই রক্ষণশীল। পুরুষ ডাক্তারদের দিয়ে মেয়েদের চিকিৎসার ব্যাপারে সামাজিক আপত্তি আছে। অসংখ্য মহিলা এর ফলে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। কেবলমাত্র মহিলা চিকিৎসকই এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। আমি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বাঙালি অধ্যাপকরা সমস্বরে প্রতিবাদ জানান।

প্রিন্সিপাল ডাঃ কোটস্—না না, ওভাবে নয়। সবাই একসঙ্গে কথা বললে সভার কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব! একজন একজন করে বক্তব্য জানান, আমি সবার কথাই শুনব।

প্রথম বাঙালি অধ্যাপক—মেডিক্যাল কলেজে কোনোদিন ছাত্রী ভর্তি করা হয়নি। এটাই একরকম প্রথা হয়ে গেছে। প্রথাবিরুদ্ধ কোনো কাজ করলে পরে সমস্যা হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যাপক—তাছাড়া এম. সি. আই. তো ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে। এরপর এ ব্যাপারে আর আলোচনার অবকাশ কোথায়?

প্রিন্সিপাল— আপনাদের অবগতির জন্য জানাই, মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নাকচ করে সরকার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে ভর্তি করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বয়ং ছোটলাট স্যার রিভার্স টমসন এ ব্যাপারে নিজে হস্তক্ষেপ করেছেন। সুতরাং কাদম্বিনীকে আমাদের ছাত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে হচ্ছে। এ ছাড়া আমি ডাঃ হার্ভের সঙ্গে একমত যে, সমাজে মহিলা চিকিৎসকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

অধ্যাপক ডাঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র—মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী ভর্তি করা কখনই উচিত নয়। এতে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করা হবে। সমগ্র পরিবেশ দূষিত হবে। আমাদের সমাজে ছেলে ও মেয়েদের মেলামেশা নিষিদ্ধ। সমবয়সী ছেলে ও মেয়েদের সম্পর্ককে আমাদের সমাজে ঘি ও আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আগুন নিয়ে ছেলেখেলা

করা উচিত নয়। ছেলেদের চরিত্র নষ্ট হবে। নষ্ট হবে একাগ্রতা। শিক্ষকরাও সকলে পুরুষ। কীভাবে তাঁরা ছেলে ও মেয়েদের জননাঙ্গ নিয়ে ছাত্রীর সামনে বক্তৃতা দেবেন? এ ছাড়া অন্য ছাত্রদের মতো ছাত্রীটিকেও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে রোগীদের পরীক্ষা করতে হবে। শুনেছি মেয়েটি বিবাহিত। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে কীভাবে সে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীদের পরীক্ষা করবে? এর জন্য তার গর্ভস্থ সন্তানের যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে তার দায় কে নেবে? মাননীয় প্রিন্সিপাল, আপনি সরকারের কাছে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করুন।

ডাঃ হার্ভে— আমি ডাঃ চন্দ্রের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আমাদের ছাত্রদের ওপর আমার আস্থা আছে। কখনই সহপাঠিনীর জন্য তাদের চরিত্র বা একাগ্রতা নষ্ট হবে না। আমাদের ভবিষ্যতের ছাত্রী কাদম্বিনী সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম স্নাতক। সে যথেষ্ট আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়শীল। এর সঙ্গে সে মেধাবী ও প্রতিভাবান। এরকম একটি মেয়েকে যদি আমরা মেডিক্যাল কলেজে ঢোকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করি, তা হলে আমরা সমগ্র নারীসমাজের প্রতি অবিচার করব। শিক্ষার প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

ডাঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র—ডাঃ হার্ভে আমাদের সমাজের সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য এ কথা বলছেন।

ডাঃ হার্ভে— আপনিই বা আপনাদের সমাজের সঙ্গে কত যোগ রেখে চলেন? বিদেশে গিয়ে ইউরোপীয়ান মহিলাকে বিবাহ করে আপনি তো সমাজে একঘরে হয়ে আছেন।

ডাঃ চন্দ্র— আপনি কিন্তু আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন।

প্রিন্সিপাল কোটস্ না না কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা মনোমালিন্য নয়। কিন্তু আমি ডাঃ হার্ভের সঙ্গে একমত। কাদম্বিনী আমাদের প্রথম ছাত্রী হিসাবে যোগ দিচ্ছেন। আমি সবাইকে ওর সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। সভা এখানেই শেষ হল। সবাইকে ধন্যবাদ।

(সকলের উত্থান)

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## পঞ্চম দৃশ্য

(দ্বারকানাথের বাড়ি। বাইরের ঘরে দ্বারকানাথ বসে বই পড়ছেন। কাদম্বিনী মেডিক্যাল কলেজে যাচ্ছেন। পরনে শাড়ির ওপর সাদা অ্যাপ্রন।)

দ্বারকানাথ— কলেজ যাচ্ছ?

কাদম্বিনী— হ্যাঁ।

দ্বারকানাথ— কলেজে সবার কাছ থেকে ঠিকমতো সহযোগিতা পাচ্ছ তো?

কাদম্বিনী— সহপাঠীরা এড়িয়ে চলে। কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে।

দ্বারকানাথ— আর অধ্যাপকরা?

কাদম্বিনী— তাঁরাও খানিকটা এড়িয়ে চলেন। অবশ্য কোনো প্রশ্ন জিগ্যেস করলে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু একজন অধ্যাপক জেদ ধরে অসহযোগিতা করে চলেছেন। কোনো প্রশ্ন জিগ্যেস করলে উত্তর দেন না। বাঁকা বাঁকা অসম্মানজনক কমেন্ট করেন।

দ্বারকানাথ— বুঝতে পেরেছি, কার কথা তুমি বলছ! সাবধান কাদম্বিনী। উনি কিন্তু তোমাকে উত্তেজিত করতে চাইছেন। যাতে অপমানিত বোধ করে তুমি কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দাও।

কাদম্বিনী— অনেক লড়াই করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছি। ডাক্তার না হয়ে আমি ওখান থেকে বেরোব না। তুমিই তো বলেছ, চলার পথ হবে কণ্টকাকীর্ণ। হৃদয় হবে রক্তাক্ত। কিন্তু লক্ষ্যে থাকতে হবে অবিচল।

দ্বারকানাথ— শাবাশ। এই তো চাই! কাদম্বিনী, তুমি পারবে। তুমি নিষ্পেষিত নারী সমাজের সামনে নতুন আলোর সন্ধান দেবে। তোমার দৃষ্টান্ত দেখে ঘুমিয়ে পড়া মেয়েরা জেগে উঠবে। নারীমুক্তি আন্দোলন গতিশীল হবে। কাদম্বিনী, আমি তোমার জন্য গর্বিত।

কাদম্বিনী— আমিও তোমার জন্য গর্ববোধ করি। তোমার আদর্শই আমার আদর্শ। তোমার স্বপ্ন পূর্ণ করার জন্য আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাব। কিন্তু এখন আমি যাই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দ্বারকানাথ— যাও, সাবধানে যেও।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## ষষ্ঠ দৃশ্য

(মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের ঘর। প্রিন্সিপাল উপবিষ্ট। সামনে বসে আছেন কাদম্বিনী ও দ্বারকানাথ।)

প্রিন্সিপাল ডাঃ কোটস্—কাদম্বিনী আমার প্রিয় ছাত্রী। মেডিসিন প্র্যাকটিকালে ও সামান্য নম্বরের জন্য ফেল করেছে। কিন্তু আমি জানি, ও মেডিসিনে যথেষ্ট কম্‌পিটেন্ট। প্র্যাকটিকালে ও ফেল করায় আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি। আমি জানি, পরীক্ষক ছিলেন মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার বিরোধী। কিন্তু পরীক্ষার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারি না।

কাদম্বিনী— তা হলে স্যার আমার কী হবে? কূলে এসে তরী ডুবল।

দ্বারকানাথ— স্যার, আপনি যদি নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে, কাদম্বিনী ফেল করতে পারে না, তাহলে দয়া করে কিছু একটা করুন।

প্রিন্সিপাল কোটস্—আমি নিশ্চিত, কাদম্বিনী স্বাভাবিকভাবে ফেল করতে পারে না। একটা পথ আছে ওর প্রতি সুবিচার করার। মেডিক্যাল কলেজ শুরুর সময় প্রিন্সিপালকে ক্ষমতা দেওয়া হয় ছাত্রদের জি. বি. এম. সি. ডিপ্লোমা দান করার। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমি কাদম্বিনীকে জি. বি. এ. সি. ডিপ্লোমা দান করে মেডিসিন, সার্জারি ও মিডউইফারিতে প্র্যাকটিস করার অধিকার দিচ্ছি। এই সঙ্গে আমি কাদম্বিনীকে ইডেন হসপিটালের মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ করছি।

কাদম্বিনী— অনেক ধন্যবাদ স্যার।

দ্বারকানাথ বাংলা তথা ভারতের স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে আপনার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার।

(প্রিন্সিপাল কোটস্ কাদম্বিনী ও দ্বারকানাথের সঙ্গে করমর্দন করলেন।)

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

**তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত**

## চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

(কলকাতার একটি রাস্তার ধারে রকের ওপর কয়েকজন বৃদ্ধের আড্ডা।)

প্রথম বৃদ্ধ— যাই বলো রমেশ, দ্বারকানাথ কিন্তু বৌকে ডাক্তার করেই ছাড়ল!

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— ডাক্তার হলেই হল! কে যাবে ওকে দেখাতে?

প্রথম বৃদ্ধ— ও কথা বললে চলবে না। ইডেন হাসপাতালে কাজ করছে। সুকিয়া স্ট্রিটে চেম্বার খুলেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। চেম্বারে যথেষ্ট ভিড়ও হচ্ছে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— আরে ভিড় তো সোনাগাছিতেও হয়। সুন্দরী মেয়েছেলে গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করবে আর ভিড় হবে না?

প্রথম বৃদ্ধ— না হে। আমাদের যোগেন তার বৌকে নিয়ে গেছল। অম্বলের ব্যামোয় অনেকদিন ধরে ভুগছিল। অনেক কিছু করেও কোনো ফল হয়নি। ওর ওষুধ খেয়ে এখন বেশ ভালো আছে।

তৃতীয় বৃদ্ধ— না বাপু, কাদম্বিনী ডাক্তারের হাতযশ আছে। ইডেনে আমার বৌমার প্রসব তো ওই করাল। বৌমা ছেলে কোলে বাড়ি ফিরেছে। মা, ছেলে দু'জনেই ভালো আছে।

(এই সময় আর এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন বগলে খবরের কাগজ।)

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— এই যে দীনুদা, এসো এসো। এরা সবাই তো ওই মেয়ে ডাক্তারের ঢাক পিটিয়ে আমার কান ঝালাপালা করে দিল!

প্রথম বৃদ্ধ— আমরা কারুর কোনো ঢাক পেটাইনি। যা সত্যি তাই বলেছি। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যথেষ্ট ভালো ডাক্তার।

দীনুবাবু— কোন্ কাদম্বিনী? তোমরা কি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর ডাক্তার বৌ-এর কথা বলছ?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— সে ছাড়া আর কে? এরা তো বলছে সে নাকি মেডিক্যাল কলেজ থেকে ধন্বন্তরী হয়ে বেরিয়েছে।

দীনুবাবু— আজকের বঙ্গনিবাসীতে মহেশ পাল ওকে নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছে, তোমরা দেখনি?

বৃদ্ধরা— না তো, কী লিখেছে? কী লিখেছে?

দীনুবাবু— বগলের কাগজ থেকে পড়ে শোনান।

"এক সুন্দরী বিবি গভীর রাত্রে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বিশেষ বিশেষ অর্থবান বাবুদের বাড়ি যাতায়াত করিতেছেন। বিবি নাকি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়া ডাক্তার। তাঁহার স্পর্শে বাবুরা চাঙ্গা হয়ে উঠিতেছেন। তাঁহাদের প্রাসাদমধ্য হইতে সঙ্গীত মূর্চ্ছনা ও নটীর নূপুরনিক্কণ পুনরায় শোনা যাইতেছে। আমাদের প্রশ্ন, গভীর রাত্রে কোন্ শাস্ত্রে বিবি কাদম্বিনী বাবুদের চাঙ্গা করিতেছেন? চিকিৎসাশাস্ত্র, না নৃত্যকলা বিদ্যা। বিবি কাদম্বিনী চিকিৎসক না নৃত্যগীত পটীয়সী এক নটী?

কিছুদিন পূর্বে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাড়ির সামনে গিরিজাসুন্দরী নামে এক মহিলা তাঁর অবৈধ প্রেমিকের হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ব্রাহ্মদের ছেলে-মেয়েদের প্রকাশ্য লীলা খেলা এবং অর্থলোভে দ্বারকানাথের নিজ পত্নীকে বাজারে বাহির করার ফলে অনুরূপ দুর্ঘটনা পুনর্বার ঘটিবার সম্ভাবনা রহিল।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধ— হল তো? খুব তো গলাবাজি করছিলে! আমি গোড়াতেই বলেছি, এ হলো দ্বারকানাথের পয়সা রোজগারের এক চাল। আরে বাবা, বেহ্মদের চরিত্তিরটাই ওইরকম।

দীনুবাবু— ঠিক বলেছ। মহেশ পাল একেবারে মাগীর কাপড় খুলে দিয়েছে। বেহ্মদেরও আর মুখ লুকোবার জায়গা রইল না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ সমাজে ওদের একঘরে করা উচিত। ওদের ডাক্তারখানায় ভদ্রলোকের যাতায়াত বন্ধ হওয়া উচিত।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

(দ্বারকানাথের বাড়ির বসবার ঘর। বসে আছেন দ্বারকানাথ, কাদম্বিনী, শিবনাথ শাস্ত্রী ও ডাঃ নীলরতন সরকার।)

কাদম্বিনী— এত অমানুষিক পরিশ্রম করে, এত অপমান সয়ে ডাক্তার হলাম। মন প্রাণ দিয়ে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হলাম। এই তার প্রতিদান? আমি আর চিকিৎসা করব না। (মুখে হাতচাপা দিলেন)

দ্বারকানাথ— (কাছে এসে কাদম্বিনীর মাথায় হাত দিয়ে) শান্ত হও। তোমাকে আগেই বলেছিলাম শয়তানের দল আক্রমণ করবেই, পথ হবে কণ্টকাকীর্ণ, হৃদয় হবে রক্তাক্ত, কিন্তু লক্ষ্যে থাকতে হবে অবিচল। তুমি ডাক্তারি ছেড়ে দিলে অসত্য আর অশুভ শক্তির জয় হবে।

কাদম্বিনী— কিন্তু এই দুর্নাম? আমি একজন বিবাহিত মহিলা। দুর্নাম নিয়ে আমি কী করে বেঁচে থাকব? রাতে আমি সেই রোগীদেরই দেখতে যেতাম যাদের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না পেলে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা ছিল। চিকিৎসক হবার সময় আমাদের Hippocratic Oath অনুযায়ী শপথ নিতে হয়েছে। এ তো আমাদের সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা।

শিবনাথ শাস্ত্রী— কোনো সৎ, চরিত্রবান মানুষ এই মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করবে না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, মহেশ পাল তোমাদের গায়ে কালি লেপন করতে পারেনি, সে কালিমা লেপন করেছে নিজের মুখে। এছাড়া আমরা ওকে ছেড়ে দেব না। দ্বারকানাথের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে আমরা ওর বিরুদ্ধে মামলা করব। ক্ষতিপূরণ আদায় করব। ওকে জেল খাটাব। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম আন্দোলনকে ও আঘাত করেছে।

ডাঃ নীলরতন সরকার—আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি। আমি ব্যারিস্টার গার্থ সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। কাদম্বিনী, তুমি বাংলা তথা ভারতের সম্পদ। তোমার এতটুকু সম্মানহানি আমরা সহ্য করব না। একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি বলতে পারি, তোমার মতো

আদর্শনিষ্ঠ চিকিৎসক আমি কখনও দেখিনি। তুমি তোমার লক্ষ্যে এগিয়ে যাও। বাইরের আঘাত সামলাবার জন্য আছি আমরা, আছে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ।

(একটি লোকের প্রবেশ)

আগন্তুক— নমস্কার, আমি দ্বারকানাথ বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

দ্বারকানাথ— আমিই দ্বারকানাথ, আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক— আজ্ঞে, বিবেচনা করুন আমি বঙ্গনিবাসী সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের কর্মচারী। পাল মহাশয় আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বিবেচনা করুন, যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য তিনি দুঃখিত। কাগজের পরবর্তী সংখ্যায় উনি দুঃখপ্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছেন।

দ্বারকানাথ— উনি একটু দেরি করে ফেলেছেন। লেখাটি প্রকাশ করার আগে ওনার ভাবা উচিত ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মামলা করব। মামলা করে ওঁকে জেল খাটাব এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করব।

আগন্তুক— বিবেচনা করুন, মামলা আপনারা করতেই পারেন। আমার বাবুও ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত, গণেশচন্দ্র চন্দ্র ও মিঃ ডানির সঙ্গে কথা বলে রেখেছেন। তাই বলছি, বিবেচনা করুন মামলার ফল আপনাদের পক্ষেও যেমন যেতে পারে, বিপক্ষেও যেতে পারে। ফলাফল যাই হোক, কাদম্বিনী মামণিকে নিয়ে কুৎসা দিনের পর দিন আদালতে আলোচনা হবে। তাই বলছি, বিবেচনা করুন ভেতরে ভেতরে মিটমাট করলে ভালো হয় না কি? বিবেচনা করুন, আমার মনিব কিঞ্চিৎ অর্থানুকূল্য করার কথাও বলেছেন।

(দ্বারকানাথ লাফিয়ে উঠে আগন্তুক ব্যক্তির কলার ধরলেন)

দ্বারকানাথ এবার আপনি বিবেচনা করুন। নিজের থেকে বেরিয়ে যাবেন না কি গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিতে হবে?

আগন্তুক ব্যক্তি না না, বিবেচনা করুন আমি নিজেই বেরিয়ে যেতে পারব। কিন্তু বিবেচনা করুন আমাদের প্রস্তাবটা ভেবে দেখলে ভালো করতেন।

(দ্বারকানাথ লোকটির দিকে কড়া চোখে তাকালেন। লোকটি দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। শিবনাথ শাস্ত্রী ও ডাঃ নীলরতন সরকার হাস্যরত।)

শিবনাথ— এবার আমরা উঠব। গার্থ সাহেবের কাছে গিয়ে মামলার ব্যাপারটা আলোচনা করার আছে।

দ্বারকানাথ— আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

কাদম্বিনী— আমি তা হলে চেম্বারে যাই। আমার কয়েকটি রুগী আসার কথা আছে।

ডাঃ সরকার— তুমি যেমন কাজ করে যাচ্ছ করে যাও। ওরা যেন না ভাবে যে, ভয়ে তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ।

(সকলের প্রস্থান)

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## তৃতীয় দৃশ্য

(দ্বারকানাথের বাড়ি। দ্বারকানাথ, কাদম্বিনী, শিবনাথ, মনোমোহন ঘোষ আলোচনারত।)

দ্বারকানাথ— আমরা প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। মহেশ পালের জেল আর জরিমানা হাইকোর্ট বজায় রেখেছে। ক্ষতিপূরণের টাকাও আদায় হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল। এর পর আর কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদক কোনো মহিলার অসম্মান করতে সাহস করবেন না। এ জয় সত্য ও ন্যায়ের জয়। এ জয় নারীমুক্তি আন্দোলনের জয়।

কাদম্বিনী— সরকারও কিন্তু আমাকে কাজের সুযোগ দিচ্ছে না। ইডেন হাসপাতালে আমাকে দিয়ে ধাত্রীর কাজ করানো হচ্ছে। কোনো ওয়ার্ডের একক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। অগ্রাধিকার পাচ্ছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আর ইউরোপীয় ডাক্তাররা। অথচ তারা বাংলা জানে না বলে রোগীদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

দ্বারকানাথ— তোমাকে বিলেত যেতে হবে। বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে না এলে এদেশে তুমি স্বীকৃতি পাবে না।

মনোমোহন— আমি দ্বারকানাথের সঙ্গে একমত। ইংল্যান্ডে আমার বাড়িতে থেকেই কাদম্বিনী পড়াশোনা করতে পারবে।

শিবনাথ— ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা করা হবে।

কাদম্বিনী— কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা কোথায় থাকবে? তাদের দেখবে কে?

দ্বারকানাথ— ওরা বিধুমুখীর সংসারে থাকবে। এছাড়া আমি তো রইলুম। আমি শুধু ভাবছি যাতায়াতের খরচার কথা।

কাদম্বিনী— চিকাগো বিশ্বমেলায় ভারতীয় মেয়েদের শিল্প সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নেব। এ থেকেই আমার ইংল্যান্ড যাতায়াতের খরচ উঠে আসবে।

শিবনাথ— তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই রইল না। প্রস্তুতি শুরু করে দাও। নারীমুক্তি আন্দোলন এক নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। প্রার্থনা করব কাদম্বিনী সফল হয়ে দেশে ফিরে এই আন্দোলনের আলোক শিখায় ভারতীয় নারীদের জীবনের অন্ধকার দূর করুক। রোগাক্রান্ত, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াক।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## চতুর্থ দৃশ্য

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গৃহ। উপাসনা মঞ্চে আচার্য উপবিষ্ট। সদস্য আসন পরিপূর্ণ। সদ্য উপাসনা শেষ হয়েছে। উপাসনায় ব্রহ্ম সংগীত পরিবেশনার শেষে আচার্যের ভাষণ শুরু হয়।)

আচার্য—(ভাষণ) একটি ঘোষণা। আমাদের সমাজের কন্যা সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের এডিনবরা নগরে এককালে তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ উপাধি পেয়েছেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে L. R. C. P. এবং L. R. C. S. আর গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে L. F. P. S. উপাধি পেয়েছেন। কাদম্বিনী আমাদের সমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী। সবাই প্রার্থনা করুন ঈশ্বর যেন এই পরিবারের সহায় হন।

সকলে সমস্বরে— সাধু, সাধু, সাধু।

### আচার্যের ভাষণ

আত্মচিন্তনই মুক্তির সোপান। 'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি'। আত্মার দ্বারাই পরমাত্মার দর্শন হয়। প্রাচীনকালে আত্মবিচার ছিল। ছিল বলেই অরণ্যে অরণ্যে তাপসাশ্রম নির্মিত হয়েছিল। আত্মবিচার ছিল বলেই দুঃখ ক্লেশ বিমোচক উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছে।

আত্ম বলতে জীবের আপনাকে যে মন বোঝায়, পরমাত্মা বলতে তার স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রা অনন্ত ঈশ্বরকে বোঝায়। বেদ-বাক্যে এই দুইকে "দ্বা সুপর্ণা" বলা হয়েছে।

এই সংসারে জীবাত্মা শরীররূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রয়েছেন। পরমাত্মার কোনো আধার নেই। তিনি নিরাধার। অশরীরী অদ্বিতীয়, পূর্ণানন্দ পরব্রহ্ম। তিনি আনন্দের সাগর। সে আনন্দের ক্ষয় নেই, হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই। তিনি অপার আনন্দ নিত্য উপভোগ করছেন। সেই প্রেমাস্পদ পরম পুরুষ সংকল্প করলেন যে, আমি আমার প্রীতিভাজন জীবাত্মাসকল সৃষ্টি করে তাদের আনন্দ বিতরণ করব। তাদের কাছ থেকে প্রীতি পূজা গ্রহণ করব। প্রীতি প্রদানে আমাদের কল্যাণ সাধিত হয়, পবিত্রতা রক্ষা পায়। প্রীতি গ্রহণে এই পরমানন্দময়ের পূর্ণ মঙ্গল ভাব প্রকাশ পায়।

আজ থেকেই তাঁর উপাসনা আরম্ভ করো। যাঁর প্রসাদে জীবনের সমুদয় সুখ-ভোগ

করছ, কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে নমস্কার করো। ভয় ও বিপদের সময় তাঁকে আশ্রয় করো, মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন নির্ভয় হয় সেইরূপ ভয়শূন্য হবে। পাপে তাপিত হলে অনুতাপ ও অশ্রুপাত করে তাঁর শরণাপন্ন হও। তিনি শরণাগত বৎসল। তিনি তোমাকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন। যিনি জগতের ঈশ্বর, রাজাধিরাজ, দেবতার দেবতা, তাঁর আরাধনা করো।

ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

**চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত**

## পঞ্চম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

(রায়বাহাদুর বটকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর বাড়ির বাইরের ঘর। রায়বাহাদুর পায়চারি করছেন। কপালে চিন্তার ভাঁজ।)

রায়বাহাদুর— দরওয়ান, নবীনকৃষ্ণকো বোলাও।

(রায়বাহাদুরের ছেলে নবীনকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন।)

রায়বাহাদুর— সাহেব ডাক্তার কী বললেন? বৌমার পেটে কী হয়েছে?

নবীনকৃষ্ণ— ডাক্তার বললেন পেটে টিউমার হয়েছে। অপারেশন করতে হবে।

রায়বাহাদুর— কে অপারেশন করবে?

নবীনকৃষ্ণ— কেন? ওই ডাক্তারই তো সার্জন, উনিই করবেন।

রায়বাহাদুর— আমার বৌমার পেটে অপারেশন করবে ফিরিঙ্গি সার্জন? অসম্ভব!

নবীনকৃষ্ণ— কিন্তু বাবা, ডাক্তার বললেন অপারেশন না করলে ও বাঁচবে না। কবিরাজ মশায়ও অপারেশনেরই বিধান দিয়েছেন।

রায়বাহাদুর— তাই বলে তো জাত ধর্ম খোয়ানো যাবে না। ফিরিঙ্গিকে দিয়ে অপারেশন করানো যাবে না।

নবীনকৃষ্ণ— তাহলে বাবা, ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে ডাকি? শুনেছি ওঁর সার্জারিতে খুব ভালো হাত।

রায়বাহাদুর— বাঙালি মেয়ে ডাক্তার অপারেশন করে? বলো কী? ভালো করে খোঁজ নিয়েছ তো?

নবীনকৃষ্ণ— হ্যাঁ বাবা, উনি ইংল্যান্ড থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। তিনটি বিদেশি ডিপ্লোমা আছে। সুকিয়া স্ট্রিটে চেম্বার; অনেক রোগীকে অপারেশন করে সারিয়েছেন।

নেপালের মহারাজার মা অসুস্থ হয়ে পড়লে ওখানকার সব ডাক্তার জবাব দিয়েছিল। উনিই তাঁকে সারিয়েছিলেন।

রায়বাহাদুর— তা হলে তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসো।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

(রায়বাহাদুরের বাড়ির বাইরের ঘর। রায়বাহাদুর বসে আছেন। কপালে চিন্তার ভাঁজ। বাইরে পালকি এসে থামল।)

(কাদম্বিনীর প্রবেশ—পেছনে ব্যাগ হাতে নবীনকৃষ্ণ।)

রায়বাহাদুর— বসুন, শরবত নিয়ে এসো।

(উর্দিপরা ভৃত্য থালায় করে শরবত, সন্দেশ, ফল প্রভৃতি নিয়ে এল। কাদম্বিনী শুধু শরবতের গ্লাসটি তুলে নিলেন।)

কাদম্বিনী— কোথায় আপনার বৌমা? কী কষ্ট?

রায়বাহাদুর— আপনি আগে বিশ্রাম নিন। শরবত খান। তারপর আপনাকে বৌমার কাছে নিয়ে যাব। সাহেব ডাক্তার বলে গেছেন বৌমার পেটে অপারেশন করে টিউমার বার করে দেবেন।

কাদম্বিনী— আগে তো আপনার বৌমাকে দেখি। তারপর টিউমারের কথা ভাবা যাবে!

রায়বাহাদুর— ওনাকে ভেতরে নিয়ে যাও।

(দু'জন মহিলা এসে কাদম্বিনীকে ভেতরে নিয়ে গেল।)

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## ষষ্ঠ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

(মঞ্চ অন্ধকার, ঘোষক কণ্ঠ ভেসে আসছে।

ঘোষক— দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়েছে। কাদম্বিনী সংসার দেখাশোনা, বাইরের প্র্যাকটিস এবং সমাজসেবামূলক কাজে লিপ্ত।)

।। মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হল।।

(কাদম্বিনীর বাড়ি। বসবার ঘরে কাদম্বিনী ও তাঁর ছেলে প্রভাতচন্দ্র চা খেতে খেতে গল্প করছেন।)

প্রভাত— মা, এবার তোমার বিশ্রাম দরকার। বড্ড বেশি পরিশ্রম করছ!

কাদম্বিনী— জং, তোমার বাবাকে আমি কথা দিয়েছি নিজের সামাজিক দায় থেকে কখনও বিচ্যুত হব না। তাই ডাক্তারির পাশাপাশি যখন ডাক এল, বোম্বাই কংগ্রেসে মহিলা ডেলিগেট হয়ে যোগ দিলাম।

প্রভাত— তোমার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী ঘোষাল ছিলেন না?

কাদম্বিনী— হ্যাঁ, এ ছাড়াও ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডের স্ত্রী রমাবাঈ রানাডে আর আমেদাবাদের সমাজ সংস্কারক মহীপৎরাম রূপরাম নীলকণ্ঠের স্ত্রী।

প্রভাত— এরপর ১৮৯০-এর কোলকাতা কংগ্রেসে কী ছিল?

কাদম্বিনী— কোলকাতা কংগ্রেসে মেয়েরা আলোচনা আর প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার পেল। আমাকে দেওয়া হল সভাপতিকে ধন্যবাদ জানানোর দায়িত্ব। আমি তো ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। তোর বাবা সাহস দিল। বলল, সাধারণভাবে বলো। তাই করলুম।

প্রভাত— শুনেছি অ্যানি বেসান্ত খুব প্রশংসা করেছিলেন।

কাদম্বিনী— হ্যাঁ, উনি তাঁর How India wrought for her freedom বইতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি আমার আট সন্তানকে আমি সমানভাবে দেখেছি।

প্রভাত— কিন্তু সতীশদাদাকে একটু বেশি ভালোবাসো।

কাদম্বিনী— ওরে দুষ্টু। দাদাকে হিংসে? আসলে সতীশ বড়ো অসহায় ছিল, তাই ওকে একটু বেশি অ্যাটেনশন দিতে হয়েছে।

প্রভাত— না, মা। আমরা সবাই তোমার জন্য গর্ব বোধ করি। আমি এমনি একটু ঠাট্টা করছিলাম।

কাদম্বিনী— কিন্তু আজ আর গল্প করার সময় নেই। আজ ময়দানে আমার পাব্লিক মিটিং।

প্রভাত— কীসের মিটিং মা?

কাদম্বিনী— দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন। ট্রান্সভালে সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের সহানুভূতি জানাবার জন্য হেনরী পোলক কলকাতায় ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেছেন। আমি এই অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী। আজ এই সভারই পাব্লিক মিটিং। বাপ্ রে আর একদম সময় নেই জং, আমি উঠলাম।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলকাতা ময়দান। কাদম্বিনী দাঁড়িয়ে। পরনে কালো পাড় সাদা শাড়ি। এলো চুল, দু'পাশে কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। চারদিক থেকে জনগণ ধেয়ে আসছেন। হাতে কাদম্বিনীর ছবি। তাঁরা স্লোগান দিচ্ছেন "গান্ধীজি জিন্দাবাদ, বর্ণবৈষম্য ধ্বংস হোক।" প্রভৃতি)

কাদম্বিনী— বন্ধুগণ, আপনারা জানেন, ভারত থেকে জোর করে দক্ষিণ আফ্রিকায় এদেশের অধিবাসীদের ধরে নিয়ে কুলির কাজ করানো হয়। ওখানকার সরকার বর্ণবিদ্বেষী। ভারতীয় শ্রমিকদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকারও তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন গান্ধীজি। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, যার কাছে যা কিছু আছে, অর্থ, জামাকাপড়, খাদ্য-সামগ্রী, আমাদের কাছে জমা দিন। সব কিছুই দুঃস্থ, আন্দোলনরত শ্রমিক ভাইদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

।। মঞ্চ অন্ধকার।।

## তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্চ অন্ধকার— ঘোষক কণ্ঠ ভেসে আসছে।

ঘোষক— দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর প্রায় ২৪ বছর কাটতে চলল। কাদম্বিনীর ছুটি নেই। তিনি কর্মযজ্ঞে লিপ্ত। গত বছরই শ্রীমতী কামিনী রায়ের সঙ্গে বিহার ও ওড়িশা প্রদেশের কোনো কোনো খনি ঘুরে মজুরনিদের অবস্থা সম্বন্ধে সরকারের কাছে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন। এর সঙ্গে সমান তালে চলছে ডাক্তারি আর পরিবারের সকলের দেখাশোনা।
আজ ৩রা অক্টোবর, ১৯২৩ সাল।
( ক্রমশ মঞ্চ আলোকিত হল।)

(কাদম্বিনীর বাড়ি। প্রভাত ও তাঁর স্ত্রী অপেক্ষারত। কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কাদম্বিনী— এঃ! বড্ড দেরি হয়ে গেল। তোরা এখনও খাসনি?

প্রভাত— তোমার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসব। কিন্তু মা, এবার তোমায় ছুটি নিতেই হবে।

কাদম্বিনী— ঠিক বলেছিস। আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেছে। কন্‌ট্রোল করা যাচ্ছে না। কিন্তু জানিস, আজকে আমার খুব ভালো লাগছে। বৌমা, লোকে বলতে শুরু করেছে ডাঃ গাঙ্গুলী বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর হাত আর আগের মতো চলে না। আজ যে অপারেশন করে এলাম, সেটা দেখলে তারা আর একথা বলতে সাহস করত না। প্রভাত, বৌমা আমার খুব ভালো লাগছে। দেহটা যেন হালকা হয়ে গেছে। আনন্দে উড়তে ইচ্ছে করছে। বৌমা, আমার খুব খিদে পেয়েছে। তুমি খাবার ব্যবস্থা করো, আমি স্নান সেরে আসছি।

কাদম্বিনী স্নান করতে গেলেন, বৌমা, রান্নাঘরে ঢুকলেন।

।। মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে এল।।

ঘোষক কণ্ঠ— সেদিন আর খাবার খেতে ফিরে আসেননি কাদম্বিনী। হঠাৎ সেরিব্রাল স্ট্রোকে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়। কাদম্বিনী আজ আর নেই কিন্তু আছে তাঁর আদর্শ, যা আজকের দিনেও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

।। য ব নি কা ।।

# দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় : ফিরে দেখা

## জন্ম ও বংশপরিচয়

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল (৯ই বৈশাখ, ১২৫১) তারিখে বিক্রমপুরের মাগুরখণ্ড গ্রামে বাঘিয়ার বিখ্যাত গাঙ্গুলি বংশে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন উচ্চবংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। মাতা উদয়তারা দেবী ছিলেন ত্রিপুরার সামগ্রামবাসী জমিদার রায়বংশের কন্যা। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ ছিলেন পরদুঃখকাতর, দয়ালু ব্যক্তি; মাতা উদয়তারা ছিলেন দৃঢ়চেতা ও ধর্মপরায়ণা নারী।

দরিদ্র কৃষ্ণপ্রাণ জীবিকার কারণে ফরিদপুরে বাস করতেন। দ্বারকানাথের দেখাশুনা ও শিক্ষার ভার মাতার উপর ছিল। তিনি দ্বারকানাথকে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক হবার যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা দ্বারকানাথের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

## শিক্ষার সূচনা

দ্বারকানাথ সাত বৎসর পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে পড়েন। এর পর তাঁর ব্যাকুল অনুরোধে তাঁকে স্কুলে পড়াবার জন্য ফরিদপুরে তাঁর বাবার কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু ফরিদপুরের জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না, তাই তিনি কিছুদিন পরে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন, এরপর তিনি পাশের কালীপাড়া গ্রামের এনট্রান্স স্কুলে ভর্তি হন।

## একটি আদর্শের জন্ম

কালীপাড়া স্কুলে মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মনীতি (১৮৫৬) ও বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১৮৫২-৫৩) পড়ানো হত। দুটি গ্রন্থেই অবৈধ বিবাহের ফল, অল্প বয়স্ক, বৃদ্ধ, উৎকট রোগগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের বিবাহের অকর্তব্যতা, অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। এইসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা এবং আলোচনার ফলে এক মহৎ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

এই আলোচনার ফলে কালীপাড়া স্কুলের কয়েকজন ছাত্র একটি সভা স্থাপন করে এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে। প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা হয়—'আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।'

প্রাচীনপন্থীরা এই ঘটনায় রুষ্ট হন। তাঁরা স্কুলগৃহে অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ছাত্ররা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অনেকেই গৃহত্যাগ পর্যন্ত করেন এবং আজীবন এই প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

এই আন্দোলন ও তার ফল সম্পর্কে দ্বারকানাথের বিবৃতি পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হল—

> ''ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে কালীপাড়া স্কুলে ধর্ম্মনীতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার পুস্তকের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হওয়াতে, কতকগুলি ছাত্র একটি সভা স্থাপন করে এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে এই বলিয়া স্বাক্ষর করে যে, 'আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।' তাহাতে প্রাচীন পক্ষীয়েরা এত রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, স্কুলগৃহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু ওই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছাত্রেরা কিছুতেই পরাঙ্মুখ হয় নাই। অনেকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ওই নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতেছেন।
>
> একটি ছাত্রের অভিভাবক তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া কহে, 'যদি তুই সভায় যাস, তবে তোকে বিনামা প্রহার করিব।' তাহাতে সে বালকটি বড়ো সদুত্তর করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, 'লোকে অসৎ কর্ম্ম করিয়া জুতা খায়, সেটি কষ্টের বিষয়। কিন্তু আমি সৎ কর্ম্ম করিয়াছি, ইহাতে যদি জুতা খাই, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই; আমি সভ্য পরিত্যাগ করিব না।' ''

ওই সময়ে দ্বারকানাথ কালীপাড়া স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন কুলীন। তাঁর পরিবারের প্রত্যেকে পুরুষানুক্রমে ৪০/৫০টি করে বিবাহ করতেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের বই দুটি পড়ে তিনি বহুবিবাহ রূপ দুষ্কর্ম সম্পর্কে সচেতন হন। তিনিও প্রতিজ্ঞা করেন, 'আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।' অক্ষয়কুমারের লেখা পড়ে দ্বারকানাথের মনে সমাজ সংস্কারের স্পৃহা জাগে। অক্ষয়কুমারের রচনা তাঁকে যুক্তিপথাবলম্বী করেছিল। তাঁর সম্বন্ধে পরবর্তীকালে 'নববার্ষিকী' পুস্তকে দ্বারকানাথের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

> ''ইনিই প্রকাশ্যভাবে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের অবৈধতা, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা দেশীয় লোকদিগকে

প্রদর্শন করিয়াছেন।—বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি যে পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, এ পর্যন্ত আর কোন ব্যক্তি সেরূপ করিয়াছেন কিনা সন্দেহস্থল।"

কর্মের সূচনা ও অবলাবান্ধবের জন্ম

দ্বারকানাথ কালীপাড়া স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। এবার শুরু হল বিভিন্ন জায়গায় কর্মের সন্ধান। বিক্রমপুরের সোনারং এবং ফরিদপুরের ওলপুরে শিক্ষকতা করার পর অবশেষে তিনি লোনসিংহ গ্রামে গিয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। এই লোনসিংহ গ্রামে অবস্থানকালেই তিনি 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কেন এই পত্রিকার উদ্ভব হল এ সম্বন্ধে দ্বারকানাথের বক্তব্য নীচে উল্লেখ করা হল—

"এ দেশীয় কুলকন্যাগণ জীবনে যে ভীষণ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যাঁহাদিগের চক্ষু আছে তাঁহাদিগের অগোচর নাই। কিন্তু যাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ তাঁহারা দেখিতে পান না। যদি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত না করিত, হয়তো আমরাও আজীবন অন্ধই থাকিতাম। একটি পরমাসুন্দরী কুলীন কন্যাকে তাঁহার আত্মীয়রা বিষপ্রয়োগ করিয়া বধ করেন। তখন আমাদিগের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ। লোকপরম্পরায় এই ঘটনা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। এইরূপে যাহার অপমৃত্যু ঘটিল আমরা তাহাকে জানিতাম, সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে একটি দারুণ আঘাত লাগিল। আমাদিগের জনৈক সমবয়স্ক ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাইলাম; এরূপ ঘটনা বিরল নহে, প্রায় প্রতি বর্ষেই ইহা ঘটিয়া থাকে। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলাম তাঁহার কথা সত্য, তৎপূর্ব্বগত দশ বৎসরে একটি গ্রাম হইতে ৩২/৩৩ টি স্ত্রীলোকের এইরূপে মৃত্যু হইয়াছে। মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে এই অবস্থায় দ্রব না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা বাল্যকালে চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকসকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজাতির ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদবোধ হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম ইহারা উপহাসের পাত্র নহে, কৃপার সামগ্রী। এই সময় হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের মমতা জন্মিল। তখন ভাবিলাম, যদি বিন্দুপরিমাণেও ইহাদিগের এই দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে পারি জীবন সার্থক হইবে। এই অভিপ্রায়েই

অবলাবান্ধবের জন্ম হয়।" (১৮৯৮, ২রা জুলাই তারিখের সঞ্জীবনীতে উদ্ধৃত।)

কুলীন কন্যাদের বিষপ্রয়োগে হত্যা তখনকার গ্রামীণ সমাজে একটি চালু প্রথা হয়ে উঠেছিল। সেকালে কুলমর্যাদার হানির ভয়ে অকুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করা সম্ভব ছিল না। তাই বহু কুলীন কন্যা অবিবাহিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হত অথবা তাদের বহুদার স্বামীকে বিয়ে করতে বা অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হত। তাই যৌবনের তাড়নায় বহু কুলীন কন্যার জীবন কলঙ্কিত হত।

সামাজিক অসম্মান ও কলঙ্ক এড়াবার জন্য অভিভাবকরা এদের বিষপ্রয়োগে হত্যা করে গ্রামে রটনা করত যে, হঠাৎ কলেরায় মেয়েগুলির মৃত্যু হয়েছে। তখন পুলিশের শাসন গ্রামে এত প্রবল হয়নি। মৃত্যুর কারণ নিয়ে কোনোরূপ তদন্ত সম্ভব ছিল না। তাই এই কুপ্রথা দীর্ঘদিন ধরে অবাধে চলে আসছিল।

এই নারকীয় প্রথার অবসান ঘটাতে দৃঢ়সঙ্কল্প দ্বারকানাথ তুমুল আন্দোলন শুরু করলেন। ১৮৬৯ সালের মে মাসে ২৫ বছরের যুবক দ্বারকানাথ প্রকাশ করলেন পাক্ষিক পত্রিকা 'অবলাবান্ধব'। নারীর অধিকার প্রতিপন্ন করে প্রতি সংখ্যা অবলাবান্ধবে তিনি অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অবলাবান্ধবের বক্তব্যকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই পত্রিকার খ্যাতিই দ্বারকানাথকে পরবর্তীকালে 'অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ' নামে পরিচিত করেছিল। অবলাবান্ধব ঢাকার ও কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন জাগিয়ে তুলল। বিক্রমপুর পরগণার অনেক যুবক এসে দ্বারকানাথের আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে সারদাকান্ত ও বরদাকান্ত হালদার, নবকান্ত, শীতলাকান্ত, নিশিকান্ত ও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এই যুবকদল বিপদ্‌গ্রস্ত কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করে কলকাতায় পাঠিয়ে তাদের সুপাত্রে অর্পণ করার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এই কাজে তাঁরা নিজেরা বার বার বিপদে পড়েছেন। এমনকী তাঁদের জীবন বিপন্ন হয়েছে। রাজদ্বারেও কেউ কেউ অভিযুক্ত হয়েছেন।

কলকাতায় আগমন ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান :

কলকাতার ছাত্রদলের নেতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী) ও উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরে লেফটেন্যান্ট উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) দ্বারকানাথকে কলকাতায় আসার জন্য বার বার অনুরোধ করছিলেন। অবশেষে কলকাতা অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হবে এই বিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়চেতা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারকানাথ প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে কলকাতায় এলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর চেষ্টায় ব্রাহ্ম মেসে বাস এবং ব্রাহ্ম সংসর্গের ফলে দ্বারকানাথ

ক্রমশ ব্রাহ্মধর্মানুরাগী হয়ে ওঠেন। এবং উৎসাহের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক আন্দোলনে যোগ দেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "একদিন কলেজে পড়িতেছি এমন সময় উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে আসিয়া বলিল, 'ওরে ভাই অবলাবান্ধবের এডিটার কলিকাতায় এসেছে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছে।' অমনি আমাদের হিরোকে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। গিয়া দেখি এক দীর্ঘাকৃতি একহারা পুরুষ, স্কুল মাস্টারের মত লম্বা চাপকান পরা দাঁড়াইয়া আছে। তিনিই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।... কিছুদিন বাদেই তিনি অবলাবান্ধব লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ববঙ্গের যুবকদিগের নেতাস্বরূপ হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের প্রতাপ উড্ডীন করিলেন।"

কলকাতায় এসে নতুন নতুন লেখকদের সাহায্যে অবলাবান্ধবের শক্তি প্রবল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হল।

## ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন

১৮৭০ সালের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ কলকাতায় আসেন। মেসে বাস এবং ব্রাহ্ম সংসর্গের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক প্রগতির একজন ধারক হয়ে ওঠেন। এই সময় বরিশাল থেকে সমাজসংস্কারক দুর্গামোহন দাস হাইকোর্টে ওকালতি করার জন্য কলকাতায় এলেন। দ্বারকানাথ এবং দুর্গামোহন অন্নদাচরণ খাস্তগীর, গুরুচরণ মহলানবিশ, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি ব্রাহ্মপ্রগতিবাদীদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী সংঘ গঠন করে 'অবলাবান্ধব' পরিচালনার পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবল আন্দোলন শুরু করলেন।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে মেয়েদের পর্দার আড়ালে বসে উপাসনা করতে হত। কিন্তু তাঁরা আড়ালের বাইরে বসতে চাইলেন। দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন, অন্নদাচরণ ও গুরুচরণ মহিলাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁদের পর্দার বাইরে বসার ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেন এবং নিজ নিজ পরিবারসহ বাইরে সকলের সঙ্গে বসলেন। এই নিয়ে সমাজে হুলস্থূল পড়ে গেল। পর্দার বাইরে মেয়েদের বসার ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের নিজের আপত্তি ছিল না কিন্তু রক্ষণশীলদের চাপে এবং সকলকে নিয়ে চলার ইচ্ছায় তিনি মেয়েদের পর্দার বাইরে বসার ব্যাপারে অনুমোদন করলেন না।

প্রগতিবাদীরা মন্দিরে আসা বন্ধ করে। বউবাজারে অন্নদাচরণ খাস্তগীরের বাড়িতে স্বতন্ত্রভাবে উপাসনার ব্যবস্থা করলেন—

> "ব্রহ্মোপাসনা। অন্নদাচরণ খাস্তগীর ভবনে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়। ৩০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৭৯৩ শক" (১২.৩. ১৮৭২) ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

কেশবচন্দ্র এ বিবাদ মিটিয়ে দিলেন এবং মেয়েদের পর্দার বাইরে বসার অনুমতি দিলেন। "ধর্মতত্ত্ব" (১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক) পত্রিকায় লিখলেন—

> "সম্প্রতি ব্রাহ্মমন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান লইয়া যে গোলযোগ হইতেছিল, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, তাহার এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যেখানে অর্গান বাদ্য আছে তাহার পূর্ব্ব দিকের স্থান রেল দিয়া ঘেরার কথা হইতেছে।"

স্ত্রী-স্বাধীনতার দল স্বতন্ত্র সমাজ তুলে দিয়ে আবার মন্দিরে ফিরে এলেন। কিন্তু শীঘ্রই স্ত্রীশিক্ষা ও সামাজিক অধিকার নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যে মতভেদ হল, তা আর মিটল না।

স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন :

১৮৭১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি কেশবচন্দ্র তাঁর ভারত আশ্রমে শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র নারীদের উচ্চগণিত, জ্যামিতি, লজিক প্রভৃতি অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক মনে করতেন না। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভেদ রাখতে চাইতেন। তিনি মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত মনে করতেন না।

দ্বারকানাথ ও অন্যান্যরা এর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দিতে চাইতেন। তাই আশ্রমের মহিলা বিদ্যালয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁরা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবছিলেন।

একটি ঘটনায় এই চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে গতি লাভ করল।

বিক্রমপুরের যুবকদলের নেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা নগরী থেকে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে একটি পত্রিকা বার করে এক আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি যুবকদলের সহায়তায় অনেক কুলকন্যাকে উদ্ধার করে কলকাতায় দুর্গামোহন দাসের আশ্রয়ে পাঠাতে থাকেন। এদের শিক্ষার জন্য প্রগতিবাদী দল চিন্তিত হলেন। আগেই বলা হয়েছে, কেশবচন্দ্র পরিচালিত নারী শিক্ষালয়ের শিক্ষায় এঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না।

১৮৭৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ২২ নং বেনিয়াপুকুর লেনে একটি বাড়ি ভাড়া

করে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বোর্ডিং স্কুলের সূচনা হল। মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস এবং তাঁর পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবীর সহায়তায় এবং অর্থসাহায্যে এই স্কুল চালু হল। মিস অ্যাক্‌রয়েড, বিচারপতি ফিয়ারের পত্নী ও দ্বারকানাথ এই স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। বিদ্যালয়টিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দ্বারকানাথ তাঁর সমস্ত দেহমন নিয়োগ করলেন।

এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

> "১৮৭৩ সালে গাঙ্গুলিভায়া কুমারী এক্রয়েড নামক নবাগতা সুশিক্ষিতা ইংরাজ মহিলাকে তত্ত্বাবধায়িকা করিয়া হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে বালিকাদিগের জন্য উচ্চশ্রেণীর এক বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিলেন। তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, যানবাহনাদির ব্যবস্থা করা, তাহাদের পীড়াদির সময় চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যের ভার একা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পড়িয়া গেল। তিনি আহ্লাদিতচিত্তে সেই সকল শ্রম বহন করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতাম যে মানুষ এতদূর শ্রম করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সংস্করণ, পৃ ৩৪৩)

১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে ঐতিহাসিক হেনরী বেভারিজের সঙ্গে কুমারী অ্যাক্‌রয়েডের বিবাহ হয় এর ফলে ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠে যায়। কিন্তু দ্বারকানাথ দমবার পাত্র ছিলেন না। ১৮৭৬ সালের ১লা জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে বাড়িভাড়া করে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। আর্থিক সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়ালেন আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাস। ব্রহ্মময়ী দেবী প্রতিমাসে ১০০ টাকা অর্থ সাহায্য করতেন।

এই স্কুল সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন—

> "বালিগঞ্জ এ একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া এই স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভায়া নিজে একজন শিক্ষক হইলেন। শিক্ষক কেন, তিনি দিবারাত্র বিশ্রাম না জানিয়া এই স্কুলের উন্নতি সাধনের জন্য দেহ মন নিয়োগ করিলেন।"

দারুণ সফল হয় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী জানা যায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় হল—"In every sense the most advanced school in Bengal." ছাত্রীরা যাতে গৃহকর্মে নিপুণা হন তাই এই স্কুলে নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক ছাত্রীকে পালা করে রান্না করতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে সেলাইও শেখানো হত। শিক্ষিত ব্রাহ্ম গৃহিণীদের অনেকেই হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়

এবং বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। প্রধান ছাত্রীরা হলেন স্বর্ণপ্রভা বসু (আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী ও আনন্দমোহন বসুর স্ত্রী), সরলা দাস (দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও পি. কে. রায়ের পত্নী), অবলা দাস (দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী), কাদম্বিনী বসু (ব্রজকিশোর বসুর কন্যা ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর পত্নী), হেমলতা দেবী (শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা), গিরিজাকুমারী সেন (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী), হরসুন্দরী দত্ত, স্বর্ণময়ী দত্ত।

ভালো বাংলা বই না থাকায় দ্বারকানাথ নিজেই অঙ্ক, ভূগোল ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের বই লিখলেন। এছাড়া জাতীয় ভাবে ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থ 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে প্রকাশ করলেন। এটিই বাংলা ভাষায় জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম পুস্তক। ১৮৭৮ সালের ১লা আগস্ট বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়, বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিলিত হয়। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ অপর একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। এই স্কুলটির নাম ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৯০ সালের মে মাসে স্কুলটি স্থাপিত হয়। চার বছর পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সমিতি আর্থিক অনটনের জন্য বিদ্যালয়টি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। স্কুলটিকে বাঁচাতে এবার এগিয়ে আসেন দ্বারকানাথ। নিজে ধনী না হয়েও তিনি ১৮৯৫ সাল থেকে বিদ্যালয়টির সর্বপ্রকার আর্থিক দায়িত্ব তাঁর একক স্কন্ধে গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়টিকে তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমৃত্যু ছিলেন বিদ্যালয়টির সম্পাদক।

## মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বারোদ্‌ঘাটন

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভুবনমোহন বসুর কন্যা চন্দ্রমুখী দেরাদুনের ডেরা স্কুল ফর নেটিভ ক্রিশ্চান গার্লস স্কুলের ছাত্রী হিসাবে এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে চেয়ে আবেদন করলেন। বহু আলোচনার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চন্দ্রমুখীকে শর্তসাপেক্ষে এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেন। শর্ত অনুযায়ী চন্দ্রমুখী পরীক্ষা পাশের উপযুক্ত নম্বর পেলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পাশের তালিকায় তাঁর নাম প্রচারিত হল না। বেথুন স্কুলের দুই ছাত্রী কাদম্বিনী ও সরলা এনট্রান্স পরীক্ষার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন। এবার দ্বারকানাথ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অনুমতির ব্যাপারে উঠেপড়ে লাগলেন। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নারীহিতৈষী স্যার আর্থার হবহাউস। দ্বারকানাথ তাঁকে সব কিছু বোঝালেন। মনোমোহন ঘোষ ও রিচার্ড গার্থ তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। অবশেষে অচলায়তনের দ্বার খুলল। ইউনিভার্সিটি সিদ্ধান্ত নিল যে একটি বিশেষ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলে কাদম্বিনী ও সরলাকে এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হবে। দুই ছাত্রীই এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ

হলেন। এর পর প্রবেশিকা পরীক্ষার পালা। সরলার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় তিনি পরীক্ষায় বসতে পারলেন না। কাদম্বিনী একাই ১৮৭৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসলেন এবং উত্তীর্ণ হলেন। এই ঘটনা সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

কাদম্বিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বেথুন স্কুলের সঙ্গে কলেজ খোলার দাবি উঠল। ১৮৭৯ সালের জুন মাসে কটক কলেজের অধ্যাপক শশিভূষণ দত্তকে নিয়ে এসে বেথুন কলেজ খোলা হল। আপাতত একমাত্র ছাত্রী কাদম্বিনী। কাদম্বিনী ১৮৮০ সালে এফ. এ. পাশ করলেন।

এর পর ১৮৮২ সলে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হলেন। তখনও ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। এইভাবে দ্বারকানাথের অনলস প্রচেষ্টায় নারীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হল।

## দ্বারকানাথের দ্বিতীয় বিবাহ

প্রগতিশীল ব্রাহ্ম দলে যোগদানের বহু পূর্বে ১৮৬২ কি ১৮৬৩ সালে হিন্দুমতে দ্বারকানাথের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭০ সনে যখন তিনি কলকাতায় আসেন তখন তিনি বিপত্নীক।

হিন্দু মহিলা বিদ্যলয়ে দ্বারকানাথ তাঁর সকল ছাত্রীদের কাছেই ছিলেন অসম্ভব শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয়।

তাঁর এক ছাত্রী আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের স্ত্রী অবলা দ্বারকানাথের শতবর্ষ উপলক্ষে মহাবোধি হলে আয়োজিত সভায় যে লিখিত ভাষণ পাঠিয়েছিলেন তা থেকে আমরা দ্বারকানাথ সম্পর্কে তাঁর ছাত্রীদের মনোভাব জানতে পারি। ভাষণটির অংশবিশেষ নীচে দেওয়া হল—

> "দ্বারকানাথের কর্ম্মপরায়ণতার স্মৃতি এখনও জাগ্রত আছে।... স্কুলের সমস্ত বন্দোবস্ত এমনকি রুটিন পর্য্যন্ত দ্বারকানাথেরই। ইংরেজি ছাড়া সব বিষয় তিনিই পড়াতেন... হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের পর বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়। এখানেও তিনিই উৎসাহদাতা। সমস্ত শক্তি দিয়া স্কুল চালাইয়াছেন।... আমরা দ্বারকানাথের কাছেই পড়িয়াছি। স্কুলে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার দৃষ্টান্তে ভবিষ্যত জীবনের কর্মপ্রেরণা পাইয়াছি।"

সম্ভবত ১৮৭৫ সালে কলকাতায় এসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ ভর্তি হন কাদম্বিনী। তখন তাঁর বয়স ১৩ অথবা ১৪। সেই বছরই দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। আদর্শ শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালক দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর মনে গভীরভাবে

ছাপ ফেলেন। তাঁর মনে দ্বারকানাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জন্ম হয়। তিনি দ্বারকানাথের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এই শ্রদ্ধা ও প্রেরণার বিষয়টি পরবর্তীকালে অন্য মাত্রা নিয়ে গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮৩ সালে দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এই ঘটনা তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজে ঝড় তুলেছিল। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত ব্যাপারকে সর্বজনীন করে দেবার একটা প্রবণতা আছে। এই বিবাহ ছিল অসবর্ণ বিবাহ। পাত্র ও কন্যার মধ্যে বয়সের ফারাক ছিল বিস্তর।

অসামান্যা সুন্দরী কাদম্বিনীর জন্ম ১৮৬১ সালে, দ্বারকানাথের জন্ম সন ১৮৪৪। বয়সে ১৭ বছরের ফারাক। এছাড়া দ্বারকানাথ ছিলেন বিপত্নীক ও দুই সন্তানের পিতা। কন্যা বিধুমুখী। পুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন মানসিক প্রতিবন্ধী। তাই দ্বারকানাথের বন্ধুরা এই বিয়ে অনুমোদন করেননি। বিয়ের রেজিস্ট্রার হন দুর্গামোহন দাস। তিনি আইন অনুসারে ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এই বিবাহ সম্পর্কে 'পরিচারিকা' পত্রিকা জানায়—

> "সংবাদ। বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুর সহিত শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। শুনিলাম এই বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু র‍্যাংলার, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ., শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ., শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্নবাবু প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াও, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিবাহসভায় উপস্থিত হন নাই। শুনা যায় দ্বারিকাবাবু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অ্যাসিসটেণ্ট সেক্রেটারি, অথচ তাঁহার বিবাহে সাধারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীর সভ্য ও প্রচারকগণ উপস্থিত রহিলেন না। কেন যে উপস্থিত রহিলেন না তাহা আমরা বুঝিতে কষ্ট পাই।" (পরিচারিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০)

এইভাবে বিতর্কের মধ্য দিয়ে দ্বারকানাথ আর কাদম্বিনীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা। এ ছিল এক দায়বদ্ধ দাম্পত্য। নারীদরদী দ্বারকানাথের অনুপ্রেরণায় কাদম্বিনীর পরবর্তী জীবন গড়ে উঠেছিল। মেয়েদের ডাক্তারি পেশায় আসার ব্যাপারে এই বিবাহের অবদান ছিল যুগান্তকারী।

## চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চায় বাঙালি মেয়ের প্রবেশ—দ্বারকানাথের সফল প্রয়াস

"নারীগণ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা না করিলে নারীসুলভ নানাপ্রকার কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারে না এবং নারীজাতির স্বাধীন জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুক্ত হইবে না।" এর পাশাপাশি তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজপতিদের অনেকের মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার ব্যাপারে মৃদু সম্মতি ছিল। কারণ মেয়েরা চিকিৎসক হলে পুরুষ চিকিৎসকদের

হাত থেকে নারীর তথাকথিত আব্রুকে নিরাপদে রাখা যাবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও মেয়েদের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাও ছিল যথেষ্ট। পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ।

১৮৮৩ সালে বি. এ. পাশ করার পর কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করলেন। শিক্ষা দপ্তর মেয়েদের ডাক্তারি পড়ায় উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। মেডিকেল কাউন্সিল কিন্তু কাদম্বিনীর মেডিকেল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে সম্মতি জানাল না।

দ্বারকানাথ ও তাঁর বন্ধুরা তুমুল আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলনের ফলে ডিপিআই সরকারের কাছে জানতে চাইলেন কী উত্তর দেওয়া হবে এই মহিলাকে। ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক মহিলাদের কীভাবে ফেরানো হবে? কারণ তখন নিয়ম অনুসারে স্নাতক মাত্রেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার অধিকারী ছিলেন।

অবশেষে এই ব্যাপারে বাংলার ছোটলাট রিভার্স অগস্টস টমসন হস্তক্ষেপ করলেন। এর ফলে ১৮৮৩ সালের ২৯ জুন সরকার মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নাকচ করে কাদম্বিনীকে মেডিকেল কলেজে ভর্তির অনুমতি দিলেন। পারিপার্শ্বিক সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে কাদম্বিনী পাঁচ বছর মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করেন।

১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে শেষ পরীক্ষা দেন। অন্য সব বিষয়ে পাশ করলেও তিনি মেডিসিনে ফেল করেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তাঁকে ডি. এম. সি. বি. উপাধি দিয়ে প্র্যাকটিশের অধিকার দেন। তিনি ইডেন হসপিটালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এইভাবে বাধার মধ্য দিয়ে কাদম্বিনী হয়ে ওঠেন বাংলার প্রথম মহিলা চিকিৎসক। এর পর দ্বারকানাথের উৎসাহে কাদম্বিনী ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত পাড়ি দেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনী এডিনবরা থেকে এল. আর. সি. পি. এবং ও. এল. আর. সি. পি. এবং গ্লাসগো থেকে এল. এফ. পি. এস. উপাধি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। কিছুদিন সরকারি হাসপাতালে কাজ করে তিনি স্বাধীনভাবে কৃতী চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন মৃত্যুদিন পর্যন্ত।

## সাহিত্যসেবী দ্বারকানাথ

ধর্ম ও সমাজসংস্কার এবং রাজনীতিচর্চা ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে দ্বারকানাথের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান পরিমাণে বিপুল না হলেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। দ্বারকানাথের সাহিত্যকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলি এবং সম্পাদিত ও পরিচালিত সাময়িকপত্র সমূহ।

## গ্র ন্থা ব লী

দ্বারকানাথ-লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল। ইংরেজি প্রকাশকাল (বন্ধনী মধ্যে) বেঙ্গল লাইব্রেরির সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির তালিকা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১। পদ্যমালা (১৮৬৯ খ্রি.)

ঈশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি পরোপকার শক্তি প্রভৃতি কিছু হিতকর বিষয় নিয়ে কয়েকটি পদ্য রচনা করা হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (অগ্রহায়ণ ১৭৯১ শক) মন্তব্য—

"বর্ণনার আড়ম্বর নাই, কল্পনার তীক্ষ্ণতা নাই; গ্রন্থকার কেবল স্পৃহনীয় সাধুভাবে আর্দ্র হইয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, এইজন্য ইহা পাঠমাত্রেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে ও সদ্ভাব জাগ্রত করিয়া দেয়। এইরূপ পদ্যময় পুস্তক বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করান উচিত। তাহা হইলে বালকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে না।"

২। বীর-নারী (ঐতিহাসিক নাটক) ১২৮১ সাল (১৫ মার্চ ১৮৭৫)

নাটকটি চার অঙ্কে সমাপ্ত। উৎসর্গপত্রে আছে—"স্নেহপ্রবণহৃদয়া শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু (আনন্দমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী) ও শ্রীমতী বিধুমুখী রায় (রজনীনাথ রায়ের পত্নী) করকমলেষু।" এই নাটকের শেষ গানটি "সোনার ভারত আজি যবনাধিকারে" দ্বারকানাথের পরবর্তী গ্রন্থ জাতীয় সঙ্গীতে সংকলিত হয়েছে।

৩। জাতীয় সঙ্গীত (প্রথম ভাগ) (১৮৭৬ খ্রি. ২৯ ফেব্রুয়ারি) নানা স্থান থেকে সংগৃহীত স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক সঙ্গীত সংকলন। এই গ্রন্থই জাতীয় সঙ্গীতের সর্বপ্রথম সংকলন।

এখানে দ্বারকানাথের আটটি গান আছে। একটি গান বীরনারী থেকে গৃহীত। বাকি সাতটির মধ্যে *'না জাগিলে সব ভারত ললনা'* (এটি শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা) গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গানগুলির শেষে রচয়িতার নামের জায়গায় (অপ্রকাশিত) বলে উল্লেখ রয়েছে। গানগুলি দ্বারকানাথেরই রচিত। এই গানগুলির মধ্যে পাঁচটি ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলীর জাতীয় সঙ্গীত বিভাগে দ্বারকানাথের নামে প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে (১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র) জাতীয় সঙ্গীতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথের চারটি সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে।

৪। জীবনালেখ্য (জীবনী) ১২৮৩ বঙ্গাব্দ (৫. ১২. ১৮৭৬) শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাসের পত্নী ব্রহ্মময়ীর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

৫। নববার্ষিকী। ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৭ খ্রি. ৭ জুলাই) বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ইয়ারবুক, বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এবং সমসাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৬। সুরুচির কুটির (উপন্যাস)

প্রথম ভাগ মাঘ ১২৮৬ (১৮৮০ খ্রি. জানুয়ারি)। দ্বিতীয় ভাগ ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১১.৮.১৮৮৪)। নিঃসম্বল কিশোর সুরেশচন্দ্র কলকাতায় এলেন, শিক্ষালাভ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। অনাথা বালিকা সুরুচির সঙ্গে পরিচয় ও বিবাহ। সুগৃহিণী সুরুচির সঞ্চয় অভ্যাসে তাঁদের সুখের সংসার গড়ে উঠল। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজের হিতসাধন ও বিবিধ সংস্কার কাজ এই উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপন্যাসটির প্রথম ভাগে পঞ্চদশটি পরিচ্ছেদ। এখানে অল্প আয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা এবং পরোপকার সাধনের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে।

উপন্যাসটির প্রথম ভাগ "মাঘোৎসবের উপহার" হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সনের জানুয়ারি মাসে। দ্বিতীয় সংস্করণ 'মেরী কার্পেন্টার গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জাতীয় ভারতসভার বঙ্গশাখার অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীমনোমোহন ঘোষ (এম. এস.) নাইট মন্তব্য করেন "আশা করা যাইতেছে যে দ্বিতীয় সম্বৎসর প্রচারিত বর্ত্তমান গ্রন্থ বঙ্গকামিনীগণের সাহিত্য শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইবে।"

১ম ভাগ 'সুরুচির কুটির' পাঠ করে মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি'তে লেখেন "যাহা হউক, উহা হইতে আমাদের স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য, অর্থ সঞ্চয় ও পরোপকার বিষয়ে অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারেন।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮০৭ শক।

উপন্যাসটির দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে চতুর্দশটি পরিচ্ছেদ আছে। এই অংশে বস্তি সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দ্বারকানাথ ইতিহাস প্রসঙ্গে লেখেন "পূর্ব্বে রাজ্যেশ্বরই রাজ্যের সর্ব্বস্ব বলিয়া গণ্য হইতেন। রাজ্যে যে প্রজার কোন অধিকার আছে, রাজা তাহা স্বীকার করিতেন না, প্রজারও সে বোধ ছিল না। সুতরাং প্রাচীন ইতিহাস রাজাদিগের জীবনের ইতিবৃত্ত মাত্র, সমাজস্থিতির প্রায় কোন বিবরণই তাহাতে নাই। কিন্তু এখন রাজা রাজ্যের সর্ব্বাধিকারী বলিয়া গণ্য নহেন। প্রজাবর্গের রাজ্যের উপর সর্ব্ব প্রধান অধিকার। প্রজাবর্গকে লইয়াই রাজ্য ও সমাজ সংগঠিত হয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আধুনিক ইতিহাসও রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদের বিবরণে পরিপূর্ণ। আমেরিকার আধুনিক লেখকেরা ইতিহাস-লেখকদিগের এই দোষ কিয়দংশে পরিহার করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের দেশের ইতিহাস-লেখকদিগের ইহা বোধ হয় এখনও দোষ বলিয়া গণ্য হয় নাই।"

সুরুচির কুটির এক বহুল প্রচারিত উপন্যাস। লেখকের মৃত্যুর পর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে প্রচারিত হয়। এই সংস্করণে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী (কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখিত?) সংযোজিত হয়েছিল।

পাঠ্যপুস্তক বালক বালিকাদের জন্য দ্বারকানাথ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। বইগুলি লেখার সময় তিনি যথেষ্ট চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লিখিত ও সঙ্কলিত পাঠ্যপুস্তকগুলির তালিকা দেওয়া হল—

১। 'কবিগাথা' জাতীয় পাঠ্যপুস্তকাবলী (সঙ্কলন) ১৮৭৭ খ্রি. এই গ্রন্থের ভূমিকার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল। এর থেকে এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে।

"বালক বালিকারা যে সকল উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠ করিলে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষানিরত স্বদেশবৎসল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সৎসাহসী ও সত্যনিষ্ঠ হইতে পারে, তাহাদিগের নিকট এরূপ ভাবের কবিতাই অধিক পরিমাণে উপস্থিত করা আবশ্যক। প্রচলিত যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা বর্ত্তমান সংগ্রহে যে অধিকতর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, আশা করি তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত থাকিবে না। স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক যে কয়টি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সঙ্কলন সময়ে আমি একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। প্রচলিত শাসনতন্ত্রের প্রতি বিরাগ প্রদর্শনকে কেহ কেহ স্বদেশানুরাগিতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। এই ভ্রম সংস্কার যে অনেকপ্রকার অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অনেকে আমাদিগের রাজভক্তি দেখিয়া মনে করিতে পারেন পরাধীনতাই আমাদের পূজ্য, বস্তুত তাহা নহে। জাতীয় স্বার্থ আমাদিগের রাজভক্তির মূল—বর্ত্তমান সময়ে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসনতন্ত্র আমরা আশা করিতে পারি না বলিয়া আমরা প্রচলিত শাসনতন্ত্রে সন্তুষ্ট। অধিকন্তু ইংরাজ রাজত্বে যে সকল দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃতিগত নহে; প্রচলিত শাসনতন্ত্রের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিয়া বৈধ উপায়ে চেষ্টা করিলে ক্রমে তাহা সংশোধিত হইতে পারে। যে সকল অভ্যাসদোষ নিবন্ধন আমরা এতদূর হেয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছি, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের তাহা সংশোধন করা আবশ্যক, আত্মশুদ্ধি ভিন্ন জাতীয় উন্নতির পথে আমাদিগের অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা নাই। অতএব যে সকল ভাব কষ্টকল্পনায়ও রাজভক্তির প্রতিকূল বলিয়া গণ্য হইতে পারে, আমি যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে সকল ভাব হৃদয়ে চিহ্নিত ও উদ্দীপিত হইলে প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা কেবলমাত্র তাহাই সমাবেশিত হইয়াছে।"

২। 'শিশুর সদাচার'। (১৮৮০ খ্রি.)

৩। 'কবিতামালা' জাতীয় পাঠ্য পুস্তকাবলী (সঙ্কলন)

১ম ভাগ (১৮৮০ খ্রি.)

২য় ভাগ

৪। সুলভ পাটিগণিত (১৮৮১ খ্রি.)

৫। শিক্ষাপ্রবেশ ১ম ও ২য় ভাগ

৬। স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

সঙ্গীতকার দ্বারকানাথ

দ্বারকানাথ ছিলেন সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। পরাধীন ভীরু বাঙালির প্রাণে উৎসাহ ও সাহস সঞ্চারের আশায় তিনি 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে এক সঙ্গীত সঙ্কলন প্রকাশ করেন। 'জাতীয় সঙ্গীতের' ২য় ভাগে দ্বারকানাথ কিছু সামাজিক ও বিশুদ্ধ প্রণয়ঘটিত সঙ্গীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' গ্রন্থের সামাজিক সঙ্গীত বিভাগে তাঁর রচিত দুটি গান আছে। দ্বারকানাথ অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' তাঁর চারটি গান মুদ্রিত হয়েছে। বঙ্গবাসী কার্যালয় প্রকাশিত 'বাঙ্গালির গানে' তাঁর রচিত বিবিধ বিষয়ক পনেরোটি গান প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি 'জাতীয় সঙ্গীত', একটি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ও দুটি 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'র সামাজিক সঙ্গীত বিভাগে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

রচনার নিদর্শন হিসাবে আমরা দ্বারকানাথের একটি গান উদ্ধৃত করছি—

(রাগিণী খাম্বাজ—তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।)

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগো জাগো গো ভগিনি,
হও বীরজায়া, বীর প্রসবিনী।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীরগণ গাঁথা, বিক্রম কাহিনী।
স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
বীর গর্ব্বে তার নাচুক ধমনী।
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

সাময়িকপত্র পরিচালনা

সাময়িকপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনায় দ্বারকানাথ দক্ষ ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা,

সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার প্রভৃতির প্রয়োজনে দ্বারকানাথ সাময়িকপত্র সম্পাদনায় অগ্রসর হন।

১। অবলাবান্ধব (১৮৬৯)

অবলাবান্ধব—পাক্ষিক পত্রিকা। ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে সম্পাদকের কর্মস্থল লোনসিংহ থেকে প্রকাশিত হত। এই কাজে তাঁর সহায় ছিলেন ঢাকার অভয়কুমার দাসের পুত্র প্রাণকুমার ও আরও কয়েকজন উৎসাহী যুবক। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২২ মে ১৮৬৯। সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বারকানাথ প্রথম সংখ্যায় লেখেন—

"এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রী সমাজের অবস্থা ক্রমশ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, আত্মকর্ত্তব্য বিধানের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাহাদিগের যে সকল ঈশ্বরানুমোদিত প্রকৃত অধিকার আছে তাহা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়, এবং বিদ্যাবিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে তাহার নিয়ত চেষ্টাই আলোচনা করিবার জন্য অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। যে সকল কীর্ত্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষার অনুকূল হইবে, সময়ে সময়ে তাহাও পত্রিকাস্থ করা যাইবে। এবং যে সকল শুশ্রূষণীয় সংবাদ রমণীদিগের করা জ্ঞাতব্য ও উপকারক, সংবাদস্তম্ভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবান্ধব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীদিগকে দেববৎ পূজা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন এরূপ মনে করেন না। এতদ্দেশীয় অবলা দিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। আমরা তাঁহাদিগের গুণের যেরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা করিব, দোষেরও সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিরাকরণ চেষ্টা পাইব।"

শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা অবলাবান্ধবে প্রকাশিত হত। তিনি লিখেছেন—

"প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের কয়েকজনকে

> অবলাবান্ধবে মধ্যে মধ্যে লিখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গেলেন। আমরা অবলাবান্ধব পড়িয়া অবাক হইতে লাগিলাম। কোন দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে এ কোন ব্যক্তি নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে এরূপ উদার মত ব্যক্ত করিতেছেন। ক্রমে গাঙ্গুলীভায়া তাঁর কলিকাতাবাসী প্রবন্ধ লেখক বন্ধুদিগকে দেখিবার জন্য একবার শহরে আসিলেন আমরা আমাদের হীরোকে দেখিয়া লইলাম। বন্ধু সমাগমে স্থির হইল যে অবলাবান্ধব কলিকাতায় তুলিয়া আনা হইবে।"

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ অবলাবান্ধব নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। শ্রীমতী রানী স্বর্ণময়ী পত্রিকার মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের জন্য ৫০ টাকা এবং আসা যাওয়ার পাথেয় হিসাবে ২৫ টাকা দান করেন। (বামাবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১২৭৭) অবলাবান্ধব কলকাতা থেকে প্রচারিত হতে লাগল। ঢাকার বন্ধুদের সাহায্য না পাওয়ায় পত্রিকা সংক্রান্ত সমস্ত কাজের ভার একা দ্বারকানাথের ওপর পড়ল। তিনি সোৎসাহে দিন রাত্রি পরিশ্রম করতে লাগলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা থেকে জানা যায় ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম সংখ্যা অবলাবান্ধব মাসিক পত্রিকার আকারে ৩০ জুলাই ১৮৭৪ প্রকাশিত হয়। অর্থাভাবে ওই বছরই পত্রিকাটির বিলুপ্তি ঘটে।

দ্বারকানাথ 'নববার্ষিকী'তে লিখেছেন—

> "১৮৬৯ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধব নামক একখানি পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এক বৎসরান্তর কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচ বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে ইহার প্রচার রহিত হয়। এই পত্রের লেখকেরা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষাগত অপ্রমাণিত পার্থক্য রক্ষায় বিরোধী ছিলেন।"

এর পাঁচ বছর পর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ মাসিক আকারে নব পর্যায় 'অবলাবান্ধব' প্রকাশ করেছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা অনুযায়ী পত্রিকার ১ম খণ্ড, ৭ম-৮ম সংখ্যার, প্রকাশকাল ২০ নভেম্বর ১৮৭৯। এবারের প্রচেষ্টাও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

২। সমালোচক (১৮৭৮—?)

১৮৭৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়ান মিরারে কুচবিহার বিবাহ সুনিশ্চিত বলে সংবাদ প্রচারিত হল। কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যার কুচবিহার রাজপরিবারে বিবাহ সুনিশ্চিত হওয়ায় প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মদল তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। এই আন্দোলন চালাবার জন্যই সমালোচকের আবির্ভাব। আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন

দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসু। প্রথম দু-তিন সপ্তাহ সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। এর পর সম্পাদক হন দ্বারকানাথ।

শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিতে' লেখেন—

> "এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে সমালোচক তুলিয়া লইয়া দ্বারিকা বাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যতদূর স্মরণ হয় সে সময় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ৯৩ কলেজ স্ট্রীটে আমার সঙ্গে থাকিতেন, তিনি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সহিত একযোগে সমালোচকের ভার লইলেন। দ্বারকানাথ দুই বৎসর সমালোচক সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

৩। সঞ্জীবনী (১৮৮৩)

সংবাদপত্র জগতে সঞ্জীবনী বিখ্যাত মূলত সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য। দ্বারকানাথ, কৃষ্ণকুমার, হেরম্বচন্দ্র ও কালীশঙ্কর শুকুলের যৌথ মালিকানায় এবং যুক্ত সম্পাদকীয় দায়িত্বে সঞ্জীবনী প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবনীর প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৫ এপ্রিল ১৮৮৩। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার যথার্থ উত্তরসাধক ছিল সঞ্জীবনী। সংবাদপত্র জগতে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। সঞ্জীবনী প্রখ্যাত হয় চা-করদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

দ্বারকানাথ আমৃত্যু এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর সঞ্জীবনীতে লেখা হয়—"খ্যাতনামা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সঞ্জীবনীর জন্মদাতা ও স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।... যখন সঞ্জীবনী সৃষ্টি হয় তখন হইতে তিনি ইহার চালক ও রক্ষকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।"

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে জনমত সংগঠন, স্ত্রীস্বাধীনতা পক্ষীয় প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সুসংগঠিত করতে এবং চা-করদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দ্বারকানাথ পরিচালিত সাময়িকপত্রগুলি এক অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

## সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ও দ্বারকানাথ

দ্বারকানাথের সমসাময়িককালে নারীমুক্তি আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই দ্বারকানাথ স্বাভাবিকভাবে কেশবচন্দ্রের অনুগামী উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে জড়িত হন।

কিন্তু নারীর সর্বাধিক স্বাধীনতা সম্পর্কে কেশবের দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, আদেশবাদ, অগণতান্ত্রিক নিয়মতন্ত্র প্রণালী সংশোধনে কেশব ও তাঁর অনুরাগীদের অনীহা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে যুব ব্রাহ্মদলের সঙ্গে মতভেদ ক্রমশই বেড়ে চলছিল। অবশেষে ৬

মার্চ ১৮৭৮ কেশবচন্দ্র কুচবিহারের রাজপরিবারে নিজের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেন। এমনকী বিবাহের পদ্ধতি অনেকটা হিন্দু মত অনুসারে হল। এর ফলে তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধ চরমে উঠল। শিবনাথ লিখলেন 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?' আনন্দচন্দ্র মিত্র ছদ্মনামে ব্যঙ্গ নাটিকা লিখলেন 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি?'

আন্দোলন চালাবার জন্য কুচবিহার বিবাহের আগেই 'সমালোচক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রের উদ্ভব হয়েছিল। শিবনাথ তার প্রথম দুই তিন সংখ্যা সম্পাদনা করেন। এরপর সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন দ্বারকানাথ। প্রতি সংখ্যায় তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলেন। শিবনাথের লেখা থেকে জানতে পারি—"কেবল তাহা নহে, সে সময়ের বিবাদ বিসম্বাদে তিনি অগ্রণী হইতে লাগিলেন।"

কেশবচন্দ্রকে আচার্যের পদ থেকে, এমনকী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদ থেকে অপসারণের চেষ্টা চলল। কিন্তু বিরোধীদল কৃতকার্য হতে পারলেন না।

ফলে তাঁরা ১৮৭৮ সালের ১৫ মে টাউন হলে সভা করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে এক স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেল। শিবনাথ লিখেছেন—"ইহার প্রতিষ্ঠার সময় দ্বারকানাথ ইহার একজন প্রধান সারথি ছিলেন।" তিনি প্রথম ১৮৮৩ সালে এবং পরে ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ সনে মৃত্যু পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

## রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বারকানাথ

"কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের আনুগত্য না করিয়া সাধারণভাবে সকল সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকের ন্যায়মতে কল্যাণসাধন করা"—এই উদ্দেশ্য নিয়ে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ, শিবনাথ প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন উৎসাহী সদস্যদের সাহায্যে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই কলকাতায় ৯৩ নং কলেজ স্ট্রিটে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন জন্ম নেয়। সভার সূচনায় সভাপতি ছিলেন শ্যামাচরণ শর্মা সরকার, সম্পাদক আনন্দমোহন বসু, যুগ্ম সহকারী সম্পাদক—'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং 'আর্য্যদর্শন' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। দ্বারকানাথ আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৬-৭৮ এবং ১৮৮১ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক সভার সদস্য এবং ১৮৮২-১৮৯৮ সনে তিনি এই সভার সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।

ভারতসভা অল্পদিনেই খুবই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। দ্বারকানাথ ভারতসভা পরিচালিত রায়ত আন্দোলন, খোলা ভাটি আন্দোলন (পল্লীগ্রামে অবাধ মদ প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন), এবং চা-বাগানে কুলি আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রায়তসভা ও দ্বারকানাথ

দেশের সর্বত্র রায়তসভা স্থাপন করে ভারতসভা রায়তদের জমিদারের হাত থেকে রক্ষা করতে যত্নবান হয়েছিল। রায়তসভা সংগঠনে দ্বারকানাথ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এবার আমরা রায়ত সম্পর্কে পূর্বসুরীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব।

রাজা রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তিনি এদেশের রায়তদের দুঃখ দুর্দশার বিষয়ে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ডিরোজিয়ানরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটারে' হুগলি জেলার মিয়াজান নামক জনৈক কৃষকের ওপর জমিদারের অত্যাচারের ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে কৃষকের আসল অবস্থা প্রকাশ করার জন্য প্রশ্নাবলি প্রচার করা হয়েছিল। পাদরি লঙ এদেশের রায়তদের মূক জন্তু ও ভূমিদাসদের সঙ্গে তুলনা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিন্দা করেছিলেন। তিনি ভূমিতে রায়তীস্বত্বদানের সপক্ষে জনমত গঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ভারতসভার নেতৃত্বে রায়তসভা কৃষকবিক্ষোভকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে সুসংগঠিত সক্রিয় প্রতিরোধের নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করেছিল। তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন করেননি কিন্তু রায়তদের অধিকার রক্ষা ও বৃদ্ধিতে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন।

রায়ত সভাগুলির আন্দোলন সরকারকে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনে উদ্যোগী করেছিল। রায়তসভা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দ্বারকানাথের ভূমিকা জানা যায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে—

> "বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ভারতসভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কালীশঙ্কর শুকুল, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও আমাকে সঙ্গে লইয়া নদীয়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার নানা স্থানে গমন করিয়া প্রজাসভার আয়োজন করিতেন। আনন্দমোহন বাবু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন কোন সভায় গমন করিয়া জমিদার ভয়ে ভীত প্রজাগণের মনে সাহসের সঞ্চার করিয়া দিতেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের সভায় প্রায় বিশ হাজার প্রজা সমবেত হইয়াছিল। কোন কোন প্রজা জমিদারের ভীষণ অত্যাচার কাহিনী সভাস্থলে বর্ণনা করিয়া সমাগত লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। পোড়াদহের সভায় প্রায় দশ হাজার লোক, কুষ্ঠিয়ার সভায় প্রায় পনের হাজার লোক যোগদান করিয়াছিল।

তারকেশ্বরে এক বিরাট সভা হইয়াছিল।... এই সকল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেন্ট প্রজাস্বত্ব আইনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।"

## শ্রমজীবী সমিতি ও দ্বারকানাথ

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বরানগরে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল (কেশবচন্দ্র অনুরাগী এবং পরবর্তীকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত) শ্রমজীবী সমিতি গঠন করেন। সমিতির প্রাণপুরুষ ছিলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সমিতিতেও দ্বারকানাথ যুক্ত ছিলেন।

## আসামের চা-শিল্প এবং চুক্তিবদ্ধ দাস কুলি

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষত দ্বারকানাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল আসামের চা-বাগানের চুক্তিবদ্ধ দাস কুলিদের মুক্তি আন্দোলন। এই ব্যাপারে আলোচনায় আসার আগে আসামের চা-শিল্প বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে আসামে আসাম কোম্পানি প্রথম চা-শিল্পে অর্থলগ্নি করে। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ওই কোম্পানি আড়াই শতাংশ ডিভিডেন্ড প্রদান করে। চিন দেশীয় চা অপেক্ষা ভারতীয় চা উৎকৃষ্টতর প্রমাণিত হয়। নীল বিদ্রোহ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল প্রস্তুত হওয়ায় নীলচাষ বন্ধ হয়। ফলে নীলচাষে বিনিয়োগ করা বিরাট মূলধন উনিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে অলস হয়ে পড়ে। এই সময় চায়ের আন্তর্জাতিক বাজার প্রসারিত হয়। ফলে নীলচাষে বিনিয়োগ করা মূলধনের বিনিয়োগের জন্য একটি নতুন লাভজনক রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে সর্বশ্রেণির ইংরেজ চা-শিল্পে মূলধন বিনিয়োগে প্রলুব্ধ হয়। ইংলন্ডের বণিক সম্প্রদায়ও ওই শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করে এবং পার্লামেন্টের ওপর যাবতীয় সুযোগ সুবিধার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

উনিশ শতকের আটের দশকে চা-শিল্পের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা জানায়, ১৮৫০ সালে চা শিল্পের জন্য ১০০০ একর জমিতে চাষ করা হত। ১৮৮১ সালে চা-শিল্পের জন্য চাষের জমি দাঁড়ায় ২০০,০০০ একর। এর মধ্যে শ্রম আইন (Labour Law) প্রযুক্ত হয় না এমন জমি ধরা হয়নি। ওই একই সময়ে চায়ের উৎপাদন ২৫০,০০০ পাউন্ড থেকে বেড়ে ৪০ মিলিয়ন বা ৪০০ লক্ষ পাউন্ডে দাঁড়ায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে চা-শিল্পে বিনিয়োগ করা মূলধন দাঁড়ায় ১৫ মিলিয়ন স্টার্লিং বা ১৫০ লক্ষ স্টার্লিং। এই মূলধনের বর্তমান মূল্য কয়েকশত কোটি টাকা।

আসামে চা-চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও মূলধনের অভাব ছিল না। কিন্তু সুদূর জঙ্গলাকীর্ণ এই এলাকায় যথেষ্ট যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। তাই কুলি সহজে জোগাড় করা যেত না। কুলি সংগ্রহের জন্য চা-কররা প্রতারণা ও অত্যাচারের

পথ গ্রহণ করল। এই অত্যাচার রোমান দাস প্রভুদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রিটিশ মূলধনকে সুরক্ষিত করার জন্য সরকার চা-করদের সর্বপ্রকার আইনের সহায়তা দেন। ১৮৩৩ সালে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে Emancipation গৃহীত হয়। এই আইন অনুযায়ী ১৮৪০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাস ব্যবসার অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো উপনিবেশগুলিতে Contract Labour প্রথার মাধ্যমে দাস ব্যবসা টিকে থাকে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে আইনের ১৩ নং ধারায় বলা হয়—"The word contract as used in this Act., shall extend to all contracts and agreements whether by deed, or written or verbal, and whether such contracts be for a term certain; or for specified work."

১৮৫৯ সালের আইনের ১৩ নং ধারায় Verbal Contract-কে contract হিসাবে গণ্য করার আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ধারার সুযোগ নিয়ে চা-কররা দেশের নানা জায়গা থেকে ছলে বলে কৌশলে কুলি সংগ্রহ করতে থাকে। চা-করদের প্রতিনিধি হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কন্ট্রাক্টর বা বাগান সর্দাররা অথবা নানা শ্রেণির আড়কাঠি কুলিদের বঞ্চনা করে চা-বাগানে নিয়ে আসত। চা-বাগিচায় আসার পর কুলিদের কোনোরকম মানবিক অধিকার স্বীকৃত হত না। অত্যাচার, অত্যাচারজনিত মৃত্যু ও বলাৎকার ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী; ইংরেজ বণিকদের অত্যাচারের সহায়ক ছিল ইংরেজের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা। এইভাবে অত্যাচার ও শোষণের মাধ্যমে চা-করদের মুনাফার পাহাড় জমে ওঠে।

চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানো হয় দেশীয় পত্র-পত্রিকায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা প্রকাশে' চা-করদের অত্যাচারের কাহিনি প্রচারিত হয়। জঙ্গলাকীর্ণ আসাম থেকে তাঁদের প্রতিনিধি জীবন বিপন্ন করে সংবাদ সংগ্রহ করেন। এর পর এগিয়ে আসেন হিন্দু প্যাট্রিয়ট। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় অত্যাচারিত চা-কুলিদের বিষয় নিয়ে লেখেন পঞ্চাঙ্ক নাটক 'চা-কর দর্পণ'। সংবাদপত্রের মাধ্যমে চা-করদের অত্যাচার জনসমক্ষে আসায় সরকার ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের ১৩ নং ধারার সংশোধন করেন।

১৮৭৩ সালের বেঙ্গল অ্যাক্টের ৭নং ধারায় এর বৈধতা অস্বীকৃত হল। গার্ডেন সর্দার এবং কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে কুলি সংগ্রহের বৈধতা চালু রইল কিন্তু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হল।

বলা হল, কিছু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া শ্রম এলাকায় সম্পাদিত কোন চুক্তির মেয়াদ হবে ১ বছর। পরে আইন অনুসারে শ্রমিকের ইচ্ছা অনুযায়ী তা বাড়ানো যাবে। শ্রম এলাকার বাইরে চুক্তির মেয়াদ হবে তিন বছর। সবরকম চুক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রেজিস্ট্রি করা হল বাধ্যতামূলক।

১৮৭৩ সালের বেঙ্গল অ্যাক্টের ৭ নং ধারা কার্যকরী হলে ভারতের এবং বিলেতের চা-করগণ ব্রিটিশ পুঁজি বিপন্ন বলে আওয়াজ তোলে এবং প্রচলিত আসাম ইমিগ্রেশন বিলের সংশোধনের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। বিলেতে চা-করগণ এক অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে ভারত সচিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এদেশের প্রভাবশালী ইংরেজ কর্মচারী, ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ এবং কিছু সংখ্যক ভারতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি চা-বাগানের শেয়ার ক্রয় করেছিলেন তাই ভারতবর্ষের সরকার তাদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। কুলিদের দুঃখ দুর্দশা বা দেশের জনমত সরকারের কাছে গৌণ হয়ে যায়।

টি ডিস্ট্রিক্টস অ্যাসোসিয়েশন (Tea Districts Association) দাবি জানায়—

১। ১৮৭৩ সালের আইন অনুযায়ী চুক্তির কাল তিন বছরকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হোক।

২। কলকাতা এবং অন্যত্র লাইসেন্স প্রাপ্ত কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে কুলি সংগ্রহের ব্যবস্থাকে কম গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুলি সংগ্রহের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হোক।

১৮৮১ সালে চা-মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের আইনের সংশোধনী প্রস্তাব বেঙ্গল কাউন্সিলে পেশ করেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বলা হয়—

১। গার্ডেন সর্দারদের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হোক। সর্দাররা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কুলি সংগ্রহের এলাকা উল্লেখ না করেই যে-কোনো সংখ্যক কুলি সংগ্রহ করতে পারবে।

২। কুলি সংগ্রহের ব্যাপারে অন্যান্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুমতি দেওয়া হোক। নির্দেশিত শ্রম এলাকায় আগন্তুককে কুলি হিসাবে চুক্তিবদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

৩। চুক্তির সময়সীমাকে তিন বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর করা হবে।

৪। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়।

আসাম কমিসারিয়েটে চুক্তিবদ্ধ কুলির চুক্তির মেয়াদ ছিল এক বছর এবং বেতন ছিল মাসিক আট টাকা। বর্তমান প্রস্তাবে প্রস্তাবিত বেতন হয় ৫ বছরের মধ্যে প্রথম তিন বছর ৫ টাকা, শেষ ২ বছর ৬ টাকা। এইভাবে প্রস্তাবে চুক্তিবদ্ধ কুলির বেতনের হার কমিয়ে দেওয়া হয়। বিলটি আইনে পরিণত হবার আগে দেশীয় সংবাদপত্রে প্রতিবাদ জানানো হয়। হিন্দু প্যাট্রিয়টে লেখা হয় কুলিদের স্বার্থে নয়, চা করদের স্বার্থেই এই আইন রচিত হচ্ছে।

বিলটির মধ্যে অনেকগুলি অসঙ্গতির উল্লেখ করা হয়। সেগুলি হল

১। কন্ট্রাক্টর কর্তৃক সংগ্রহ করা কুলিদের দু'বার মেডিক্যাল পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক না রেখে ম্যাজিস্ট্রেটের ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। ফলে পথিমধ্যে কুলিদের মৃত্যুহার অনেক বেশি বেড়ে যাবে বলে প্যাট্রিয়ট আশঙ্কা প্রকাশ করে।

২। চুক্তিবদ্ধ কুলিরা ইচ্ছামত চা-বাগান ত্যাগ করতে পারত না। এমনকি অর্থের বিনিময়েও তাদের মুক্তি সম্ভব ছিল না। কোনো কুলি পালিয়ে গেলে ওয়ারেন্টের সাহায্যে তাদের গ্রেপ্তার করে চা-বাগানে ফেরত দেওয়া হত অথবা শাস্তি দেওয়া হত। প্রস্তাবিত আইনে চা-করদের নিযুক্ত যে-কোনো ব্যক্তি আদালতের ওয়ারেন্ট ছাড়াই পলাতক কুলিকে ধরে এনে চা-বাগানে কাজ করতে বাধ্য করতে পারত।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা এই অধিকারকে আমেরিকার Fugitive Slave Law প্রদত্ত অধিকারের সঙ্গে তুলনা করেছে।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন বিলটিতে সম্মতি দান করেন। ১৮৮২ সালে বিলটি আইনে পরিণত হবার পর কন্ট্রাক্টরদের চেয়ে গার্ডেন সর্দারদের সংগ্রহ করা কুলির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। বহু কুলিকে প্রতারিত করে বিনা রেজিস্ট্রেশনে চা-বাগিচায় আনা হয়।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের 'Report on Inland Emigration' থেকে জানা যায়—

আসাম, কাছাড়, সিলেট এবং চট্টগ্রামে বাইরে থেকে নিয়ে আসা কুলির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩১,৫৪০। এর মধ্যে ৯৬৮৯ জন কুলিকে রেজিস্ট্রেশন করে আনা হয়। ২১,৮৫১ জনকে রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই নিয়ে আসা হয়। এছাড়া বহু কুলি পথমধ্যে অব্যবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় কন্ট্রাক্টর বা সর্দাররা এই মৃত্যুর দায় এড়িয়ে যেতে পারত। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর রামকুমার বিদ্যারত্নকে প্রচারের উদ্দেশ্যে আসামে পাঠানো হয়। এই প্রচার কাজের মধ্য দিয়ে রামকুমার কুলিদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে পরিচিত হন। কলকাতায় ফিরে রামকুমার ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের এই বিষয়ে জানান। তিনি ভারতীয় কুলিদের ওপর নির্মম অত্যাচারের কথা নিয়ে 'উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ কুলিদের ওপর এই নির্মম অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন ভারতসভার কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।

১৮৮১ সালে লর্ড রিপনের কাছে ভারতসভার পক্ষ থেকে নির্যাতিত কুলিদের ব্যাপারে রামকুমারের পুস্তকসহ একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কিন্তু বড়লাট

রিপন কুলিদের রক্ষা করার আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরই পাশাপাশি ইংরেজ বিচারকরা চা-করদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতেন।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ, হেরম্বচন্দ্র ও কালীশঙ্কর শুকুলের যৌথ মালিকানায় ও যুক্ত সম্পাদনায় 'সঞ্জীবনী' প্রকাশিত হল। এবার রামকুমার বিদ্যারত্ন আসামের ইংরেজ বিচারকদের বিচারের প্রহসন ওই পত্রিকায় প্রকাশ করতে লাগলেন।

নিজেদের কুকীর্তির কথা প্রকাশ পাওয়ায় চা-কররা প্রকাশ্যে বলতে থাকে—"The contributor to the Sanjibani will be first victim to the of planter's gun."

গভর্নর জেনারেলের কাছে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত মেমোরিয়াল পেশ করা হয়। দ্বারকানাথ, কৃষ্ণকুমার, হেরম্বচন্দ্র, কালীশঙ্কর প্রভৃতি নেতারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটি স্মারকলিপি পার্লামেন্ট সদস্য উইলিয়াম স্কায়োন মারফত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য পাঠালেন। কিন্তু রিপনের মতো একজন উদারনৈতিক গভর্নর জেনারেলের পক্ষে ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থ-বিরোধী শোষণ বন্ধের জন্য কোনো মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতসভা চা-বাগানের কুলিদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য দ্বারকানাথকে আসামে পাঠালেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

> "তখন বর্ষাকাল সমাগত। ব্রহ্মপুত্র জলপূর্ণ হইয়া দুইধার প্লাবিত করিতেছে; যাতায়াত দুঃসাধ্য, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কত অনুরোধ করা গেল, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না, জলে ঝড়ে প্লাবনে স্বকার্য্য সাধনে রত রহিলেন। একদিন পথ চলিতে চলিতে নদীর স্রোতে জলমগ্ন হইলেন। সেদিন অতি কষ্টে তাঁর প্রাণ রক্ষা হইল। তথাপি তাঁহার উৎসাহ বা কার্য্যতৎপরতার বিরাম রহিল না। সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত রহিলেন। ওদিকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়া সর্বত্রই গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ; অধিকাংশস্থলে ডেপুটি কমিশনারগণ বাঙালি ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে তাঁহার বিষয় সংবাদ গ্রহণ করেন।
>
> এইরূপ অসুবিধার মধ্যেও কার্য্য করিয়াও তিনি চা-বাগানের কুলীদের বিষয়ে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন এবং 'সঞ্জীবনী'তে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই হতভাগ্য কুলীদের দুরবস্থার বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, তাঁহার প্রেরিত সংবাদে লোকের চিত্ত চমকিয়া উঠিল,

কুলীদের রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দিন দিন কুলী সংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট কুলী আইনের সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐ আইন সংশোধন করিয়াও এক্ষণে যাহা আছে তাহাও নির্দ্দেশ নহে। এখনও হতভাগ্য কুলীগণ না জানিয়া আপনাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় করিয়া বন্দীদশাতে দিনযাপন করিতেছে। আর দ্বারকানাথ নাই, তাহাদের জন্য কাঁদিবার লোকও নাই।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৪৪)।

দ্বারকানাথ অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বহুবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও বাগিচা থেকে বাগিচায় ভ্রমণ করেন। সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ লিখে সঞ্জীবনী ও বেঙ্গলীতে প্রকাশ করেন।

ভারতসভার একাদশ বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয় "In course of the year under report, Babu Dwaraka Nath Ganguli was sent as a delegate of the Indian Association to enquire into the condition of Assam Coolies. He collected a vast mass of the valuable information which appeared in the news papers and the attention of the Secretary of the State for India has been called in the matter."

পরবর্তী বৎসর ভারতসভার দ্বাদশ বর্ষের রিপোর্টে বলা হয় "No action has been taken inspite of persistent disclosures of Newspaper, which revealed a ghostly tale of horror and condition of things which practically amounted to a species of slavery, thriving under the protection of British Laws and sanctioned by the British Government."

(প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া)

দ্বারকানাথের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে 'ব্রিটিশ ভারতে দাসত্ব' বিষয়ে কতকগুলি পত্র ও প্রবন্ধ বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ছিল ১৮৮৬-৮৭। মানুষকে বাণিজ্যে পণ্য করার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল। কয়েকটি সংবাদ ও মতামত আমরা উদ্ধৃতি করছি—চা-বাগানে আহার বাসস্থানের কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। আসামের ১৮৮৪ সালের স্যানিটারি রিপোর্ট (Sanitary Report of 1884) থেকে জানা যায় যে, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও দূষিত খাদ্যদ্রব্যের জন্য প্রতি ১০,৬৬৮টি মৃত্যুর মধ্যে ২৬২৪ জন পেটের গণ্ডগোলে মারা যান। অর্থাৎ শতকরা ২৪.৫টি মৃত্যুর কারণ ছিল পেটের গণ্ডগোল (Acute Gastroenteritis) মৃত্যুর হার ছিল নিম্নরূপ—

১৮৮২ সালে প্রতি হাজার জনে (১০০০) ৩৭.৮ জন।

১৮৮৩ সালে প্রতি হাজার জনে (১০০০) ৪১.৩ জন।

১৮৮৪ সালে প্রতি হাজার জনে (১০০০) ৪৩.২ জন।

চা-বাগানে শিশুমৃত্যুর হার ছিল অত্যধিক। সমীক্ষায় জানা যায়, প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে ৪৪ জন শিশুর অকালমৃত্যু হত। জোড়হাটের চা-কোম্পানির সিনিয়ার মেডিক্যাল অফিসার (Senior Medical Officer) ডাঃ গ্রের মতে, বর্ষাকালে Infantile typho Malarial form-এ সর্বাধিক শিশুর মৃত্যু হত।

শিবসাগরের ডেপুটি কমিশনার জানান যে, কামিনরা শিশু জন্মাবার পরের দিন বা কয়েকদিন পরেই কাজে যোগ দিতে বাধ্য হত। মাতৃত্বের জন্য কোনো ছুটি ছিল না। ফলে একজন শিশুকে সঙ্গে নিয়ে অথবা বস্তিতে ফেলে রেখে তারা কাজে বেরোত। এর ফলে বহু শিশুর মৃত্যু হত। শুধু তাই নয়, শিশুকে লালনপালন করা অসম্ভব জেনে বহু কামিন তাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করতে বাধ্য হত। এই কাজ করে কয়েকজন দাই প্রচুর অর্থোপার্জন করে। অবৈধভাবে কুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চা-কররা দেশের সর্বত্র প্রতারণার জাল ছড়িয়ে রেখেছিল। এই বিষয়ে তাদের সহায়ক ছিল রাজধানী কলকাতার পুলিশ বিভাগ। ভারতসভার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারে একটি চিঠি লেখেন বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারির কাছে। এই চিঠিতে তিনি চা-করদের প্রতারণার কাজে সহায়তার অভিযোগে পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কার্যকলাপের তদন্ত দাবি করেন। চিঠিটিতে অভিযোগে জানান হয়—

১৮৮৯ সালের ১২ এপ্রিল দ্বারকানাথ খবর পেলেন গঞ্জাম জেলার একদল কুলিকে কলকাতায় চাকরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে আসামে চালান দেওয়া হচ্ছে। দ্বারকানাথ ময়দানে গেলেন এবং কুলিদের আশ্রয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। পুলিশ কমিশনারকে জানানো হলে তিনি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু পরদিন দ্বারকানাথ জানতে পারলেন যে, পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় আড়কাঠিরা কুলিদের আসামে চালান করে দিয়েছে। ইংরেজ বিচারকগণ ছিলেন চা করদের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট। বেঙ্গলীতে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র, সংবাদ ও প্রবন্ধে ইংরেজ বিচারালয়ে প্রহসনের উল্লেখ আছে। দু-একটি কাহিনি এখানে দেওয়া হল।

মিঃ রানবান নামে এক চা-কর সাহেব বনগলানী নামে জনৈকা কামিনকে ধর্ষণ করে। প্রথমে সে কামিনটির কোল থেকে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে আছাড় মেরে মৃতপ্রায় করে তোলে। এরপর বলপূর্বক কামিনটিকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করে। পুলিশ কেস হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অজস্র প্রমাণ ও সাক্ষী ছিল। কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির মিথ্যা সাক্ষ্যে চা-কর সাহেব মুক্তি পায়। কিন্তু এখানেই ঘটনার শেষ নয়। ওই চা-কর সাহেবই ওই সহায়সম্বলহীনা কামিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে। ইংরেজের বিচারে তার জরিমানা হয়। (Proceedings of the

Criminal Case Court, Zillah Darang, Subdivision Mangaldai, Case 1060-760 of 1887)

চা-কর সাহেবরা কামিনদের শাস্তি দেবার সময় তাদের গোপন অঙ্গে বেত্রাঘাত করত। ফলে গোপন অঙ্গ প্রদর্শন করতে হবে এই লজ্জায় তারা আদালতে অভিযোগ করতে পারত না। কামিনদের স্বতন্ত্র বিবৃতি গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে লালগোলা চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ গর্ডন একটি অল্পবয়স্ক কুলিকে লাথি মেরে হত্যা করে। এক্ষেত্রেও দু'জন সাহেবের মিথ্যা সাক্ষ্যে গর্ডন নিরপরাধ সাব্যস্ত হয়। কখনও কখনও চা-কররা দোষী প্রমাণিত হলেও তাদের লঘুদণ্ড দেওয়া হত।

কাছাড় জেলার কাউয়ালিয়া চা-বাগানের ম্যানেজার প্রকাশ্যে একজন শিশু কুলিকে বেত্রাঘাত করে। উত্তেজিত কুলিরা ম্যানেজারকে কয়েক ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখে। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ম্যানেজারকে ২০০ টাকা জরিমানা করেন এবং ঘেরাও করার জন্য কুলিদের তিনদিন থেকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

দ্বারকানাথ শুধু সংবাদপত্র এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে আন্দোলন করেই ক্ষান্ত হলেন না। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা কুলি সমস্যা বিষয়ক প্রস্তাব তুলতে চাইলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কর্মকর্তারা কুলি সমস্যাকে প্রাদেশিক সমস্যা বলে আলোচনায় রাজি হলেন না। বাস্তবে কিন্তু কুলি সমস্যা প্রাদেশিক সমস্যা ছিল না। ১৮৮৪ সালের Labour Emigration Report থেকে জানা যায় আসামে ওই সময়ে কুলির সংখ্যা ১,৮০,৮৩১। পুরুষ ১,০২,৫৫৭ এবং নারীর সংখ্যা ৭৮,২৭৪। এই কুলিদের শতকরা ৫৫ জন আসামের, ৪৪.৭ জন সাঁওতাল পরগনার, শতকরা ২৭.২ জন বাংলাদেশের, শতকরা ২১.২ জন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের। বাকি কুলিরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের।

কিন্তু সেই সময়ের বৃহৎ জমিদার এবং মুৎসুদ্দী প্রভাবিত কংগ্রেস নেতৃত্ব ইংরেজ প্রভুদের বিরাগভাজন না হওয়ার জন্য কুলিদের সমস্যা আঞ্চলিক সমস্যা বলে এড়িয়ে গেল।

কিন্তু দ্বারকানাথরা ছাড়বার পাত্র না। তাঁরা অন্যান্য প্রাদেশিক সমস্যার সঙ্গে কুলি সমস্যার আলোচনার জন্য প্রাদেশিক সম্মেলনের আহ্বান করলেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সর্বপ্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সভাপতি ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। সভায় বিপিনচন্দ্র পাল কুলিদের সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য একটি তদন্ত কমিশনের দাবি জানান। তিনি আরও প্রস্তাব দেন যে, এই কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে কুলি সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হোক। সভাপতির অনুরোধে প্রস্তাবটি সমর্থন করে দ্বারকানাথ একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

এরপর কয়েক বছর ধরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কুলি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। অবশেষে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে চা-বাগানের কুলিদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য সরকার কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই কমিশন সিলেট এবং কাছাড় জেলা ব্যতীত আসামের সর্বত্র চুক্তিবদ্ধ কুলি নিয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বাংলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের কাছে সরকার নিয়োজিত কমিশনের সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি জানান।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে কুলি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতে পারেনি। এবার কিন্তু কংগ্রেস নেতারা কুলিদের দাসত্ব মোচনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বিষয়টি আলোচ্য সূচিতে গ্রহণ করলেন। Inland Emigration Act বাতিল করার প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হল।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে কুলিদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়। কুলি প্রথার অবসানও দাবি করা হয়।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন বসল। আসামের চীফ কমিশনার হেনরী কটন আসামের চা-শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। বড়লাট লর্ড কার্জন প্রথমে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেও পরে চা-করদের কথায় মত পরিবর্তন করেন। কংগ্রেস স্যার কটনের প্রস্তাব সরকার কার্যকর না করায় দুঃখপ্রকাশ করে। অবশেষে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্যার হেনরী কটনের চেষ্টায় ইন্ডেঞ্চার সিস্টেমের অবসান ঘটে। আড়কাঠিদের অত্যাচারও কিছু পরিমাণে নিবারিত হল।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথের মৃত্যু হওয়ায় দ্বারকানাথ তাঁর অনলস সাধনার সুফল দেখে যেতে পারেননি।

## অকুতোভয় দ্বারকানাথ

দ্বারকানাথ চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল তাঁর তেজস্বিতা। নিজের আদর্শে তিনি অটল থাকতেন। যিনি যত বড়ো লোকই হোন না কেন তাঁর সম্মুখে নিজ কর্তব্যে অবিচল হয়ে দাঁড়াতে এবং স্পষ্ট কথা বলতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হতেন না। দ্বারকানাথের নির্ভীকতা ও আত্মমর্যাদাজ্ঞানের কিছু নিদর্শন এখানে দেওয়া হল।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে গিরিজাসুন্দরী নামে এক বিধবা খুন হন। ঘটনাটি ঘটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাড়ির সামনে। শোনা যায়, তাঁর ব্যর্থপ্রণয়ী এই খুন করেছিলেন। 'বঙ্গনিবাসী' পত্রিকা এই ঘটনার ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। এই নিবন্ধের

কোনো কপি পাওয়া যায়নি। কিন্তু জানা যায়, এই ঘটনার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম-সম্মিলনী, দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনীকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। কাদম্বিনীকে নটী বলে উল্লেখ করে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়। গর্জে উঠলেন দ্বারকানাথ। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হল। কাদম্বিনীর পক্ষে দ্বারকানাথ, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং ব্রাহ্মদের পক্ষে ডাঃ নীলরতন সরকার। বিচারপতি ট্রেভিলিয়নের এজলাসে মামলাটি ওঠে। 'বঙ্গনিবাসী' পত্রিকার পরিচালক মহেশচন্দ্র পালের পক্ষে আদালতে ওকালতি করেন তারকনাথ পালিত, গণেশচন্দ্র চন্দ্র ও মিঃ ডানি। গার্থ সাহেব দাঁড়ান ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে। আদালতে মহেশচন্দ্র প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। তিনি বললেন—দ্বারকানাথ বা কাদম্বিনীকে কোনোরূপ আঘাত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ভুলবশত তেমন কিছু হলে তিনি দুঃখিত। বাদী চাইলে পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় বিবৃতি ছাপার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কিন্তু দ্বারকানাথ অনড় ছিলেন। বিচারে মহেশচন্দ্রের হয় ছ'মাস জেল এবং সঙ্গে ৫০ টাকা অর্থদণ্ড। কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেও জেল খাটার হাত থেকে বাঁচতে পারলেন না তিনি। বিচার হয় চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এ. পি. হ্যান্ডেলের আদালতে। দ্বারকানাথ ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন এক লাখ টাকা। আদালত তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেন। সঙ্গে দিতে হয়েছিল মামলার সব খরচ।

পরিমল গোস্বামীর স্মৃতিচিত্রণ থেকে জানতে পারি আর একটি পত্রিকাতেও কাদম্বিনীকে কটাক্ষ করে একটি বিশ্রী কার্টুন প্রকাশিত হয়। নারায়ণ দত্ত জানান, "কার্টুন সম্বন্ধে শোনা যায় সেটি নাকি ধূমপানরতা কাদম্বিনীর ব্যঙ্গ চিত্র।"

পরিমল গোস্বামী তাঁর স্মৃতিচিত্রণে লেখেন—"প্রভাতচন্দ্রের পিতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির ধর্মে আঘাত দিয়েছিলেন এক কাগজের সম্পাদক। তাঁর ধর্ম ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার। সেই সম্পাদক দ্বারকানাথ ও তাঁর প্রচেষ্টাকে কার্টুন ছবির সাহায্যে বিদ্রূপ করেছিলেন। দ্বারকানাথ উত্তেজিতভাবে লাঠি নিয়ে সম্পাদকের বৈঠকে হাজির; পকেটে তাঁর সেই কাগজের বিদ্রূপাংশ। সেটি পকেট থেকে বের করে সম্পাদকের মুখে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'Eat your words'—'Eat your words.' বলেছিলেন আর লাঠি দিয়ে তাঁর মুখে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছিলেন।... দ্বারকানাথ ঐ সম্পাদকের কথা প্রথমে আহার করিয়েছিলেন এবং পরে তাঁকে দিয়ে প্রত্যাহার করিয়েছিলেন।"

পরিমল গোস্বামী কাগজটির নাম জানাননি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর একটি ঘটনা উল্লেখ করে আমরা এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করব। "একবার দ্বারকানাথ বৈঠকখানার রাস্তায় একটি গলির সম্মুখে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এমন সময় একখানি গাড়ি

আসিয়া ওই গলির মুখে লাগিল। গাঙ্গুলি দেখিলেন, একজন ইংরাজ গাড়ি হইতে নামিয়া গলির মধ্যে গেলেন। গাড়ির গাড়োয়ান "সাহেব ভাড়া, সাহেব ভাড়া" বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিল। ইংরাজটি ফিরিয়া তাকে প্রহার করিতে উদ্যত। সে পশ্চাতে সরিয়া পড়িল। এইরূপে সে সঙ্গে যায়, ইংরাজ তাড়া করে ও সে সরিয়া পড়ে। অবশেষে সে গাঙ্গুলি মহাশয়ের সাহায্য চাহিল। গাঙ্গুলি তাহাকে বলিলেন, "চলো সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করি, ওর বাড়ির নম্বর দেখি, কাল ওর নামে নালিশ করিস, আমি সাক্ষী দিব।" এই বলিয়া ইংরাজটির কাছে তাহার নাম জানিতে চাহিলেন। সে নাম দিল না পরন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। গাঙ্গুলি মহাশয় আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। দুইজনে খুব ঘুসাঘুসি চলিল। এই ব্যাপার ঐ ইংরাজের দ্বারের সম্মুখে চলিল। তৎক্ষণাৎ তাহার ভবন হইতে অপর তিন-চারিজন ইংরাজ আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন ও গাড়োয়ানের ভাড়া দিতে চাহিলেন। বিবাদ থামিয়া গেলে, প্রথমোক্ত ইংরাজ যখন গাঙ্গুলি মহাশয়ের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিতে আসিল, তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমার মত কাপুরুষের সহিত শেকহ্যাণ্ড করি না।" (সঞ্জীবনী, ২ জুলাই ১৮৯৮)

এইরকম আরো অনেক ঘটনা আছে। অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও ভয় পেতেন না। তাঁর কাছে রাজাধিরাজ রাজাও যা ছিলেন, একজন দীন দরিদ্রও তাই ছিল। মানুষের মনুষ্যত্বের আদর করতে তাঁর মতন কারোকে দেখা যায়নি।

## প্রয়াণ অভিমুখে

দ্বারকানাথ কিছুদিন থেকে যকৃতের পীড়ায় (Hepatitis) কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর চিকিৎসক ছিলেন তখনকার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বার্চ। সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর চিকিৎসক পত্নী কাদম্বিনী। কিন্তু সবার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮৯৮ সালের জুন মাসে এই পীড়া গুরুতর আকার ধারণ করে।

বাংলায় তখন চলছে প্লেগ মহামারি। চলছে মৃত্যুর মিছিল। আতঙ্কিত জনগণ কলকাতা ছেড়ে দলে দলে পালাচ্ছেন। প্লেগ প্রতিরোধের একটি বিশেষ উপায় টিকা প্রদান। কিন্তু অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জন্য টিকার ব্যাপারে জনমানসে তীব্র ভীতি ও অনীহা। অনেকেই মনে করতেন প্লেগের টিকা নিলেই নিশ্চিত মৃত্যু। গুরুতর অসুস্থ, প্রায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত দ্বারকানাথ তাঁর বাড়ির সকলকে টিকা নিতে নির্দেশ দেন। নইলে জনসাধারণের ভয় কাটবে না।

ভগিনী নিবেদিতা খবর দিচ্ছেন—"মে ২৭, ১৮৯৮ ব্রাহ্ম বাড়ির ৬০ জন প্লেগের টিকা নেন।"

দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনীর নাতনি পুণ্যলতা চক্রবর্তী লিখেছেন, "আমরা প্রায় আড়াইশো লোক ছোটো-বড়ো ছেলেমেয়ে সব জড়ো হয়ে স্কুল বাড়িতে একসঙ্গে টিকা নিলাম। আর সেই খবরটা সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপান হল, যাতে সমস্ত লোকের মনের ভয় ভেঙ্গে যায়।" এই ঘটনার এক মাসের মধ্যে ২৭ জুন, ১৮৯৮ (১৩ আষাঢ় ১৩০৫) শেষ রাত্রে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন দ্বারকানাথ। আজীবন সত্যান্বেষী, সামাজিক প্রগতির সংগ্রামী নায়ক দ্বারকানাথ মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও দেশ ও জাতির প্রতি আপন কর্তব্য পালন করলেন। কুসংস্কারবিরোধী, যুক্তিবাদী এই মানুষটি জানতেন, প্লেগকে প্রতিরোধ করতে গেলে টিকা নেওয়া কতখানি জরুরি। নিজের পরিবার ও পরিজনের মধ্যে সেটা চালু করে দেশবাসীর কাছে স্থাপন করলেন এক মহান দৃষ্টান্ত।

## উপসংহার

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর সঞ্জীবনী যে শোকসংবাদ প্রকাশ করে, তার কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি—

> "আজ শত্রু মিত্র সকলেই হায় হায় করিতেছেন, একজন মানুষের মত মানুষই আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন।... তাঁহার প্রকৃতি এই ছিল যে, তিনি যাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহার সাধনে ফলাফল, লাভালাভ, স্তুতি নিন্দা কিছুই গণনা করিতেন না।... তাঁহার প্রকৃতিতে এই একটা মহৎ গুণ ছিল যে তিনি যে কার্য্যে মন দিতেন, তাহাতে সমগ্র হৃদয় মনের শক্তি দিতেন, অর্দ্ধেক হৃদয় দিয়া দুর্ব্বলভাবে কাজ করিতে পারিতেন না। সাহস ও সত্যনিষ্ঠাতে তিনি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যিনি যত বড়ো লোকই হউন না কেন, তাঁহাকে স্পষ্ট কথাটি বলিতে ও তাঁহার সমক্ষে নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেন না। শত্রু মিত্র সকলকেই আজ বলিতে হইবে গাঙ্গুলি ডরাইবার ছেলে ছিলেন না। তোষামোদ, পদস্থ ব্যক্তির উপযাচকতা, পদগৌরবের লোভ এ সকল তাঁহাতে ছিল না। তাঁহার অতি বড়ো শত্রুও একথা বলিতে পারিবেন না যে, গাঙ্গুলি কাপুরুষের ন্যায় গোপনে পরোক্ষে কাহাকেও আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার মহৎ মন এরূপ নীচাশয়তার অনেক উপরে বাস করিত। তাঁহার নির্ভীকতা ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের অনেক নিদর্শন আছে, যে সকল শুনিলে বাঙ্গালির রক্তেও মনুষ্যত্বের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়।...

অন্যায় নিবারণের জন্য তিনি প্রাণকে প্রাণ জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার অনেক গুণের কথাই মনে হইতেছে। যে তাঁহার ঘোর শত্রু, তাহাকেও কেহ অন্যায়রূপে নিন্দা করিতেছে দেখিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য অগ্রসর হইতেন। অপরকে কোনও স্বার্থত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নিজে তাহা করিতেন, নিজে যাহা করিতেন না তাহা কাহাকেও করিতে বলিতেন না। অধিক কি বলিব, তিনি আপাদমস্তক নিরেট ও খাঁটি ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে রাজাধিরাজ রাজাও যাহা, আর একজন দীন দরিদ্রও তাহা ছিল। মানুষের মনুষ্যত্বের আদর করিতে এরূপ কাহাকেও দেখি নাই।

আমরা তাঁহার বন্ধু বলিয়া কি তাঁহার কোন দোষ দেখি নাই? তাঁহার ন্যায় তেজীয়ান জীয়ন্ত প্রকৃতিতে গুণ ও দোষ দুই উৎকণ্ঠ হইয়া থাকে। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর মধ্যে তাঁহার দোষও দেখিয়াছি। তাহার উল্লেখের সময় এ নয়।... এডওয়ার্ড আর্ভিং এর মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কার্লাইল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"আমাদের এই কৃত্রিমতাপূর্ণ ও ছায়াময় জগতে একজন খাঁটি মানুষ আসিয়াছিল, এরূপ মানুষ মধ্যে মধ্যে না আসিলে জগৎ মাটি হইয়া যাইত।" ঠিক কথা! ঠিক কথা! কৃত্রিমতাপূর্ণ জগতে এই সকল অকৃত্রিম মানুষ বড়োই স্পৃহণীয়, বড়োই আদরণীয়, বড়োই প্রয়োজনীয়। বিধাতা করুন আমরা মধ্যে মধ্যে এরূপ মানুষ পাই।" (সঞ্জীবনী, ২ জুলাই, ১৮৯৮)

৩ থ্য সূ এ

১. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৮০, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, কার্তিক ১৩৫০।
২. বাংলার নারী জাগরণ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা।
৩. কালজয়ী কাদম্বিনী ও তাঁর কাল, সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১২।
৪. আসামের চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ, অমর দত্ত, কলকাতা, ২০০৯।
৫. উনিশ শতকের স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলন ও ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, এবং এই সময়, বর্ষা সংখ্যা, ১৪২০।
৬. কলকাতায় প্লেগ ও ভগিনী নিবেদিতা, সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, এবং এই সময়, শীত সংখ্যা ১৪২০।

৭. বাংলার নারী জাগরণ দ্বারকানাথের যুগ, তিতাস মিত্র, জিজ্ঞাসা, অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪০৪।

৮. সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড, স্বপন বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৩।

পা ঠ ক প্র তি ক্রি য়া

## প্রসঙ্গ 'অনন্যা কাদম্বিনী'

### আবুল আহসান চৌধুরী

শাস্ত্রে-ধর্মে-সমাজে-সংসারে-সাহিত্যে নারী নানা রূপে ও পরিচয়ে প্রকাশিত। এই প্রেক্ষাপটে বাঙালি নারীর জীবনকে বিচার করলে দেখা যাবে শাস্ত্র-ধর্মে তার মর্যাদা-মূল্য প্রায় অস্বীকৃত, নারীর স্বাতন্ত্র্য-স্বাধিকার-স্বাধীনতা কখনো সমাজের অনুমোদন বা আনুকূল্য পায়নি, সংসারে নারী ছিল আটপৌরে জীবনযাপনের বৃত্তাবদ্ধ। উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বাঙালি নারীর জীবন চলেছে এই গতানুগতিক ছকে। ওই শতকের গোড়া থেকেই বাঙালির জীবনে ও সমাজে লাগলো এক নতুন আলোর ঝলকানি—তাতে ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করলো কুসংস্কার-অজ্ঞতা-রক্ষণ-শীলতা অশিক্ষার জমাট বাঁধা আঁধার। অন্দরমহলের অবরোধবাসিনী নারীর মুক্তির দিন পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলো—কিন্তু সেই পথে ছড়িয়ে ছিল নানা শক্ত বাধা—প্রবল ভাবেই ছিল পরিবারের-সমাজের-শাস্ত্রের চোখ-রাঙানি—তবে প্রতিজ্ঞায়-সাহসে-সংকল্পে দৃঢ় নারীর অগ্রযাত্রাকে এসব কিছুই থামিয়ে দিতে পারেনি। বাঙালি নারী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে পেশাগত ও সামাজিক জীবনে প্রবেশ করলো শিক্ষক, সমাজসেবক, লেখক, সাময়িকপত্রসেবী বা চিকিৎসক হিসেবে। এই নারীজাগরণের প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১- ১৯২৩)।

কাদম্বিনীর জীবন নাটকীয় বিন্যাসে রচিত—'উপল-ব্যথিত-গতি'র জীবন। তাঁর অর্জন ও প্রতিষ্ঠা কালের নিরিখে ঈর্ষণীয়। মেধাবী-বিদুষী-একাগ্র-নৈষ্ঠিক-অলোকিত-কৃতী-যুগন্ধর—এ-সব বিশেষণ তাঁর জন্যে সমান প্রযোজ্য! উনিশ শতকে তমসাচ্ছন্ন অন্তঃপুর থেকে আলোকিত চত্বরে বেরিয়ে আসা কতিপয় বঙ্গরমণীর মধ্যে অগ্রণী তিনি। প্রথম বাঙালি সেই সঙ্গে ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও স্নাতক উত্তীর্ণা প্রথম ভারতীয় মহিলা—এই গৌরব তো ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়ও বটে। কাদম্বিনীর এই কৃতি জীবন নির্মাণে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা ও সমর্থন পেয়েছিলেন কীর্তিমান স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে—সেই দ্বারকানাথ যাঁকে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের 'নায়ক' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই দম্পতির বয়সের ফারাক ছিল যথেষ্টই, তবে কর্মের ও আদর্শিক ঐক্যের বন্ধনে তাঁরা ছিলেন একই সমতলে।

এই কীর্তিময়ী মহীয়সী রমণী সম্পর্কে সম্প্রতি 'অনন্যা কাদম্বিনী' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর লেখক সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজেও একজন কৃতী চিকিৎসক। পেশাগত দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি মূলত নতুন তথ্যে নতুন বক্তব্যে উনিশ শতকের কৃতবিদ্য বাঙালি চিকিৎসক ও অনুষঙ্গী বিষয়ে মূল্যবান কাজ করে চলেছেন। শল্যবিদ মধুসূদন গুপ্ত, আর. জি. কর, নীলরতন সরকার এবং আরও কারো কারো সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন। সেসব লেখা আখ্যানধর্মী নয় মোটেই, সে ঐতিহ্যপ্রাণিত সন্ধিৎসু গবেষকের কাজ।

সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'অনন্যা কাদম্বিনী' সৃজন-মননের এক অপূর্ব যুগলবন্দি। এখানে সংকলিত হয়েছে কাদম্বিনীর সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যঋদ্ধ জীবনকথা। বিশেষ শ্রম ও নিষ্ঠায় প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিবর্ণ পাতা থেকে চয়ন করেছেন কাদম্বিনী-প্রসঙ্গ। মূল্যবান তথ্যের এই উজ্জ্বল উদ্ধার উত্তরকালের গবেষকদের জন্যে বিশেষ সহায়ক হবে তা বলাই বাহুল্য। সংযোজিত হয়েছে যুগপুরুষ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তথ্যনিষ্ঠ জীবনালেখ্য। এই তিনটি রচনায় সুবীর চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা-প্রবণতার পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু যে-রচনাটি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করে তোলে সেটি কাদম্বিনীর চরিত-নাটক, গ্রন্থনামেই যার নামকরণ—'অনন্যা কাদম্বিনী'।

জীবনী-নাটক রচনা সহজ নয়—বাস্তবের খ্যাতিমান কোনো মানুষের জীবন নাটকে রূপায়িত করতে গেলে উদার কল্পনা কিংবা আরোপিত ঘটনার সহায়তা গ্রহণ করা চলে না। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়, তাই বলা চলে, অসাধ্যই সাধন করেছেন কাদম্বিনীকে নিয়ে নাটক লিখে। শুনেছি, এরই মাঝে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়ে বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছে। কী দৃশ্যরচনা কী চরিত্র চিত্রণ কী সংলাপ—সব দিক দিয়েই নাট্যকারের নৈপুণ্যের কথা কবুল করতে দ্বিধা হয় না।

নানা পেশাগত জগৎ ও অঙ্গন নিয়ে সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে—তেমনি চিকিৎসক ও চিকিৎসাজগৎ নিয়েও যে মননধর্মী ও সৃজনশীল সাহিত্য রচনার সম্ভাবনা প্রচুর, তার পরিচয় আবার নতুন করে পাওয়া গেলো এই বই—'অনন্যা কাদম্বিনী'তে। অভিনন্দন সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়কে—এই কাজের নিষ্ঠ-নিবেদিত উদ্যোগী হিসেবে।

মাননীয়

শ্রীসুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার নামের আগে পরিচিতিবাচক কোনো শব্দ ইচ্ছা করেই প্রয়োগ করলাম না। আপনি একই সঙ্গে ডাক্তার, অধ্যাপক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার—বহুমুখী আপনার প্রতিভা।

আপনার লেখা 'অনন্যা কাদম্বিনী' পড়লাম। ভালো লাগল এবং বহু তথ্যে সমৃদ্ধ এই বইটি পড়ে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। আশা করি, যাঁরা পড়বেন, আমার মতো তাঁরাও উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বাংলার সমাজজীবনে উনিশ শতকে বাঙালি মেয়েদের শোচনীয় অবস্থার কথা। এই পরিবেশ থেকেই প্রচলিত সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিকূলতাকে জয় করে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কিভাবে প্রথম মহিলা চিকিৎসক হিসাবে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উন্নীত হয়েছিলেন; এই বিষয়টিকেও প্রথমে প্রবন্ধাকারে ও পরে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরে আপনি একটি মহৎ কাজ করেছেন। আমার মতো পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করে অনেক অজানা তথ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, নাট্যরূপায়ণের ফলে ইতিহাসের তথ্য রসালো সাহিত্যে পরিণতি লাভ করেছে। গ্রন্থের পরবর্তী দুটি অংশ 'সংবাদ-সাময়িক পত্রে কাদম্বিনী' এবং 'ফিরে দেখা' তথ্য সমৃদ্ধ ও বহু পরিশ্রমের বিষয়।

আপনার নাটকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উপকরণ প্রচুর। রক্ষণশীল সমাজপতিদের বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্র, কিশোরী কাদম্বিনীর মনে দ্বারকানাথের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার, সামাজিক প্রতিকূলতা—এ রকম দু-একটি প্রসঙ্গ আরও বিস্তৃতভাবে, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে নাটকীয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেতো বলে আমার মনে হয়েছে।

আপনার এই প্রয়াসে আমি মুগ্ধ। প্রকাশনার কাজটিও যথাযথ হয়েছে। বইটা দেখলেই পড়তে ইচ্ছা হয় ও পড়া শুরু করলে শেষ না করে থামা যায় না। এই কাজের জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই।

অধ্যাপক ড. রতনকুমার নন্দী
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

## অনন্যা কাদম্বিনী :লেখক সুবীর চট্টোপাধ্যায়

বইটি হাতে পেয়ে এবং অনন্যা কাদম্বনীর অনন্য চিত্রটি দেখে পাঠকের ভালো লাগে। উনিশ শতকের নবজাগরণ নিয়ে বঙালি বুদ্ধিজীবীরা অজস্র বই লিখেছেন। বর্তমান সমালোচক ওই উনিশ শতকেই বাস করেন। তবে মহিলা চিকিৎসকদের ওপর চর্চাটা সাম্প্রতিক। সর্বপ্রথম কলম ধরেন চিত্রা দেব। বইয়ের নাম 'মহিলা ডাক্তার ভিনগ্রহের বাসিন্দা'। তারপরে বর্তমান লেখকের টুকিটাকি লেখা, বক্তৃতা। কাদম্বিনীকে নিয়ে পুরো পিএইচডি-র কাজ করলেন সৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুরে তাঁরই পরিচালনায়। দিল্লি থেকে প্রকাশিত তাঁর 'কাদম্বিনী' বিশ্বখ্যাত হয়ে গেল। এরপরে একে একে সোমা বসু ও সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু ডাক্তারি থেকে বেরিয়ে এসে মূল্যবান কাজ করেছেন বর্তমান লেখক, প্রখ্যাত এনাটমিস্ট সুবীর চট্টোপাধ্যায়। ২০০১ সাল থেকে রেনেসাঁস এর চিকিৎসকদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তারই ফসল এই গ্রন্থটি। এর তিন নম্বর অধ্যায়ে পাবেন কাদম্বিনীর জীবনী, চার নম্বরে তাঁকে নিয়ে নাকি 'অনন্যা কাদম্বিনী', পাঁচ নম্বরে সংবাদ-সাময়িক-পত্রে কাদম্বিনী, ছয় নম্বরে তথা শেষ অধ্যায়ে—কাদম্বিনীর স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মূল্যায়ন। এর মধ্যে সংবাদপত্র থেকে বিচিত্র তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। অন্তরে, অন্দরে কাদম্বিনীকে জানা যায় এই অধ্যায়ে।

বর্তমান লেখকের কাছে সবচেয়ে অনবদ্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন এটি। কাদম্বিনীকে নিয়ে নারীবাদীরা অনেক বাড়াবাড়িও করেছেন, কিন্তু নেপথ্য-নায়ক দ্বারকানাথ উপেক্ষিত থেকে গেছেন। দ্বারকানাথের প্রযত্নে না থাকলে কাদম্বিনীকে আমরা পেতাম না।এই বই পড়ুন, পড়ান।

অধ্যাপক ড. চিত্তব্রত পালিত
প্রতিষ্ঠতা অধ্যাপক, কর্পাস রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
অধ্যক্ষ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটফর হিস্টোরিকাল স্টাডিস্

চিত্তব্রত পালিত
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
১৭/০৮/২০১৮

অধ্যাপক সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'অনন্যা কাদম্বিনী' পুস্তকের পাঠক সমালোচনা—

কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায় মহিলাদের তথা তাদের আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার ইতিহাস এক অবিস্মরণীয় নাম—অবিস্মরণীয় প্রতিভা। যদিও তাঁর এই পথ পর্যটন খুব একটা মসৃণ ছিল না। পদে পদে ছিল বাধা বিঘ্ন এবং অপমান। অপবাদের আঘাত। যে ইতিহাসের অনেকটাই আজও আমাদের অনেকেরই হয়তো অজানা।

এই অজানা অচেনা তথ্য যিনি সকলের সামনে উপস্থাপনা করেছেন, তিনি অধ্যাপক ডাঃ সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবিকায় শিক্ষক চিকিৎসক। নেশায় সাহিত্য-সাধক। এ কেবলি ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা বা জীবনাদর্শের দর্শন নয় বা জীবন-সমরের কাহিনি নয় এ যেন বাস্তব এক সমাজচিত্রের রূপায়ণ—যা আমাদের সকলকে অচিরেই নিয়ে যায় বহুপূর্ব কালীন এক সমাজব্যবস্থা অব্যবস্থার মাঝে—পরিচয় করায় অদৃশ্য, অভাবনীয় অকল্পনীয় এক জগতের সঙ্গে, এক সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অব্যবস্থার সঙ্গে। এই সকল অনুভব-অনুভূতি লাভ হয় একটা জীবনীনাট্য বা নাট্যানুষঙ্গের মাধ্যমে। যা আমাদের টেনে নিয়ে যায় অপূর্ব এক নাট্যমাধুর্যের আঙ্গিকে—সেই প্রাচীনকালে যে আমাদের উপস্থাপন করে বহুতর ঘটন অঘটন সমাজ/ রাজনীতি/ জীবন নীতির গতিতে জনরঙ্গে—আর সেখানেই বোধহয় সার্থকতা এই লেখকের এই লেখনীর এই রচনার, এই রচনাপ্রবাহের।

হাসি দাশগুপ্ত

অধ্যাপক ডাঃ হাসি দাশগুপ্ত
অধ্যক্ষ
কলেজ অফ মেডিসিন
ও সাগর দত্ত হাসপাতাল

কলকাতা মেডিকেল কলেজের
শিক্ষালাভ ও কর্মজীবনের বর্ণনা আ
কলেজের প্রাক্তনী হিসাবে বরাব
আমার আছে। তাই ডাঃ সুবীরকু
খুব আনন্দ হল। কাদম্বিনী দেবীর
গভীরভাবে গবেষণা করে, লেখব
বইটিতে তুলে ধরেছেন—যেমন
যাওয়া ও এডিনবরা ও গ্লাসগো
ভাষায় লেখা বইটি সহজেই পাঠ

থম ছাত্রী কাদম্বিনী দেবীর চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চ
রা 'অনন্যা কাদম্বিনী' বইটির মধ্যে পাই। মেডিকেল
ই কলেজের ইতিহাস সম্পর্কে একটা কৌতূহল
র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা এই বইটি পেয়ে
ীবনের বহুলাংশই আমাদের কাছে অজানা ছিল।
এই মহীয়সী বঙ্গীয় রমণীর সম্বন্ধে নানা তথ্য এই
বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করা, বিলেত
থেকে ডিগ্রি অর্জন করা। সবলীল ও চিত্তাকর্ষক
কর মন জয় করে নেয়।

অধ্যাপক ডাঃ শর্মিলা পাল
বিভাগীয় প্রধান, অ্যানাটমি
মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা।

বাংলা জীবনী সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল সংযোজন 'অনন্যা কাদম্বিনী'। বিশিষ্ট চিকিৎসক সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ শ্রমে বিদুষী কাদম্বিনীর একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেছেন। কাদম্বিনীর জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে বরিশালের চাঁদসীতে। ১৮৭৮-এ বেথুন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার জন্য বেথুন স্কুলে এফ. এ. ও পরে বি. এ. ক্লাস খোলা হয়। ১৮৮৩-তে বেথুন কলেজ থেকে তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসেবে বি. এ. পাশ করেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেরও তিনি প্রথম ছাত্রী। ১৮৮৪-তে ভরতি হলেন বটে, তবে অধ্যাপকদের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ও সেই কারণে ১৮৮৮-তে মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েও কেবল মেডিসিন-এ উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। ফলে এম. বি. উপাধি না পেলেও অধ্যক্ষ প্রদত্ত জি. বি. এম. সি (গ্রাজুয়েট অফ্ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ) উপাধি লাভ করেন। ১৮৯২-তে তিনি ইংল্যান্ডে যান। পরের বছর এ. আর সি. পি. (এডিনবরা) এবং এল. এফ. পি. এস (গ্লাসগো) উপাধি নিয়ে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে চিকিৎসা ছাড়াও নানা সামাজিক-রাজনীতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৩-র ৩ অক্টোবর তার জীবনাবসান ঘটে।

এই সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস সুচারুভাবে তথ্য যোগে পরিবেষণ করেছেন অধ্যাপক সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই জীবনী গ্রন্থটির তিনি একটি নাট্যরূপও দেন ও সেটি ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে এবং বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে।

বইটির উল্লেখযোগ্য সংযোজন সংবাদ-সাময়িকপত্রে কাদম্বিনী। এটি বইটির একটি উজ্জ্বলতম অংশ। পুরানো সাময়িকপত্র ঘেঁটে ঘুঁটে তিনি এই শ্রম সাপেক্ষ কাজটি করেছেন। এটি বইটিকে একটি অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। দ্বিতীয় সংযোজন—'দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ফিরে দেখা'। এটিও বইটির অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ। দ্বারকানাথের সংগ্রামী জীবনের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। বইটি সুখপাঠ্য ও ভাষা প্রসাদগুণসম্পন্ন। প্রচ্ছদচিত্রও মনোরম। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক ড. সুবিমল মিশ্র
সহ সভাপতি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ডাঃ সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক, তাঁর নেশা বাঙালি সমাজের ওপর উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা। এক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন বিশিষ্ট বাঙালি চিকিৎসকদের। প্রথম বাঙালি শল্যচিকিৎসক মধুসূদন গুপ্তকে বলতে গেলে পুনরাবিষ্কার করেছেন তিনি। তাঁর 'অনন্যা কাদম্বিনী' বইয়ের বিষয় প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলির জীবন ও সাধনা। কিরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কাদম্বিনী তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সমাজে লেখক তা বর্ণনা করেছেন ঝরঝরে ভাষায়। যে মানুষটিকে এই সাধনায় এবং ব্যক্তিজীবনে দিশারী হিসেবে পেয়েছিলেন কাদম্বিনী, সেই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনীও লেখক পরিবেশন করেছেন এই বইয়ের একটি অধ্যায়ে। লেখকের গবেষক সত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'সংবাদ-সাময়িক পত্রে কাদম্বিনী' শীর্ষক অধ্যায়ে। নিরলস পরিশ্রমে জীর্ণ পত্রিকার পৃষ্ঠা হাতড়ে যেভাবে তিনি আবিষ্কার করেছেন কাদম্বিনী সম্পর্কিত সমাচার তা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি যে কেবল গবেষক তাই নয়, তাঁর সৃজনীপ্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া যাবে এই বইয়ে। 'অনন্যা কাদম্বিনী' চরিত নাটকটি প্রমাণ করে তিনি একজন সার্থক নাট্যকার। দৃশ্যকল্পনা ও সংলাপ রচনার নৈপুণ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া সময়কে তিনি তুলে এনেছেন আমাদের চোখের সামনে। চরিত নাটক রচনায় তাঁর খ্যাতি আছে। এই নাটকটি সেই খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। বইটি বহুল প্রচারিত হলে একালের পাঠক নতুন করে চেনার সুযোগ পাবে প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে।

অশোক উপাধ্যায়

## অনন্যা কাদম্বিনী-কে

### যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তীব্র বও স্বোতস্বিনী—
দুমড়ে মুচড়ে নামো, ভেঙে দাও এ বন্ধুর মাটি
বয়ে যাও দুকূল ছাপিয়ে
উপলখণ্ডেরা থাক বুক জুড়ে, শান্ত পরিপাটি।
তীব্র বাধা উথাল-পাথাল
সরিয়ে পাথর নুড়ি কঠিন প্রস্তর
দুর্দম দুর্মদ হয়ে হও অগ্রসর
বিরহীর মন নিয়ে পৌঁছে যাও মোহানায়
ঝাঁপ দাও দুস্তর সাগরে
তোমার মিষ্টি জল, যাক মিশে যাক
উত্তাল ঢেউয়ের তালে, লবণাক্ত জলে
নীলকণ্ঠ এ সাগর প্রাণ ফিরে পাক
প্রাণের বদ্বীপ গড়ো, মোহনায় আনো পলিমাটি।

স্রোতস্বিনী, আমি জানি, তোমাতেই আছে
ভাঙার অমোঘ শক্তি, গড়ার রসদ—
তোমাতে সঞ্চিত আছে জীবনের মদ,
সৃষ্টি-ধ্বংস দুই হাতে খেলার পুতুল
ভেঙেছ এক কূল যদি গড়ো ওই কূল
জোগাও শিকড়ে জল, কখনো দুর্বার, করো শিকড় নির্মূল।

প্রফেসর সুবীর চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'অনন্যা কাদম্বিনী' পাঠের প্রেরণায় সদ্য পাঠ-অনুভূতিতে রচিত। যাদব চট্টোপাধ্যায়, কিষাণগঞ্জ, ২৩/৫/১৮

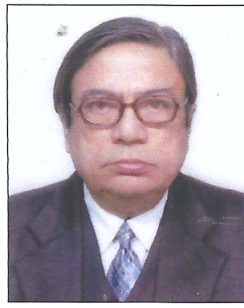

ডাঃ সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং অ্যানাটমির একজন খ্যাতকীর্তি অধ্যাপক। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় অ্যানাটমিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক (২০০৫-২০০৮) এবং সভাপতি (২০০৮-২০১০) ছিলেন।

শুধু চিকিৎসা ও অধ্যাপনা জগতে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তিনি ডুব দিয়েছেন গবেষণা ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায়। উনিশ শতকের আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে বাংলার চিকিৎসাজগতে যাঁরা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের নিয়েই তাঁর গবেষণা। লিখেছেন মধুসূদন গুপ্ত, ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ। এদেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসক ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি শুধু শ্রমনিষ্ঠ গবেষণাই করেননি, তাঁর দ্বন্দ্বময় জীবন ফুটে উঠেছে লেখকের রচিত অনন্যা কাদম্বিনী নাটকে। কাদম্বিনীর জীবনী, সমকালীন সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষ্য। জনপ্রিয় নাটকটি এবং কাদম্বিনীর স্বামী সমাজবিপ্লবী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী স্থান পেয়েছে এই বইটিতে। নাটকটি ইতিমধ্যে বারংবার প্রচারিত হয়েছে আকাশবাণী কলকাতা বেতার কেন্দ্রে।

লেখকের সম্পাদিত গ্রন্থগুলি—

স্মরণে মননে মধুসূদন গুপ্ত

ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের "প্লেগ"

মধুসূদন গুপ্ত ও অনন্ত আলোকপ্রবাহ।

# অনন্যা

# কাদম্বিনী

BANGLAR MUKH
ISBN:978-93-84108-75-5
9 789384 108755

বাঙলার মুখ